কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫।৪৬ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য

তাপস-কাহিনী

[আউলিয়া অর্থাৎ মুসলমান মহর্ষিগণের
অলৌকিক জীবনী-কথা]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক,
হজরত মোহাম্মদ, শাহ্‌নামা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
মোজাম্মেল হক্
প্রণীত

মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস্
কলেজ স্কয়ার (ইষ্ট) : কলিকাতা

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ আফজাল্‌-উল হক্‌
৩, কলেজ স্কয়ার ; কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন ; কলিকাতা
১৩৩।৪৪

মুখবন্ধ

এক সময়ে মুসলমানগণ উন্নতির স্বর্ণ-সিংহাসনে রাজাধিরাজরূপে বিরাজিত ছিলেন। কি অতুলনীয় শৌর্য্যশালী দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ, কি অলৌকিক জ্ঞানরত্নমণ্ডিত ধর্ম্মরত তপস্বী, কি অগাধ ধীশক্তিশালী প্রিয়বাদী পণ্ডিত, কি অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মধুরকণ্ঠ মহাকবি, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। পরিচয় কি দিব? সুসভ্য মুসলমান জাতির অশেষ জ্ঞানের আকরস্বরূপ সাহিত্য-বিজ্ঞান ও কাব্যেতিহাস অনুসন্ধান করুন, অধুনা এই পতিত জাতির বিগত জীবনের অমানুষিক কার্য্যকলাপ, অস্তগত রবির শেষ চিহ্ন—উজ্জ্বল রশ্মি দর্শনে বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে এরূপ কতিপয় মহাতপা আউলিয়ার অর্থাৎ মুসলমান মহর্ষির জীবন-কাহিনী বিবৃত করিব, যাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, অলৌকিক তপোনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-প্রেমিকতার বিষয় অবগত হইয়া পাঠককে নিঃসন্দেহে বিস্মিত ও চমকিত হইতে হইবে। আউলিয়াদিগের মধ্যে মহাপুরুষ হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (যিনি সাধারণতঃ বড় পীর নামে খ্যাত) অলৌকিকত্বে ও গুণ-গরিমায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান পুরুষেরই জীবনবৃত্তান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিকর্ত্তা সর্ব্বমঙ্গলময় মহামহিম বিশ্বস্রষ্টার নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহার পরমপ্রিয় অকৃত্রিম

ভক্তবৃন্দের স্বর্গীয় চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া অজ্ঞতাবশতঃ যদিই কোন ত্রুটি বা তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক নামের অসম্ভ্রম ঘটে, তবে তিনি এ দীনাত্মা অকিঞ্চনকে যেন কৃপা বিতরণে ক্ষমা করেন। ইহাতে ভাব ও ভাষাগত ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে সহৃদয় পাঠকগণ স্বীয় গুণে উদারতা প্রদর্শন করিবেন, ইহাও অন্যতর নিবেদন।

বিনয়াবনত—

শান্তিপুর—নদীয়া মোজাম্মেল হক্

২য় সংস্করণের নিবেদন

সহৃদয় পাঠকগণের অনুগ্রহে 'তাপস-কাহিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে ইহার স্থানে স্থানে সংশোধিত এবং ইহাতে তাপস নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জীবন-কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত সাধারণ ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলে আমি পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শান্তিপুর বিনীত—

বৈশাখ, ১৩২১ মোজাম্মেল হক্

সূচী

'প্রবাসী' বলেন,—"এই গ্রন্থে আউলিয়া বা মুসলমান মহর্ষিগণের অলৌকিক জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে এমন সমস্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। সাত জন তাপসের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।"

'বঙ্গবাসী' বলেন,—"গ্রন্থের যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তখন বাঙ্গালী পাঠকসমাজে ইহা নিশ্চিতই আদর পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষায় বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। ঋষি-মহর্ষির সাধন-প্রক্রিয়া, ক্রিয়াকলাপ বা লক্ষণ-নির্ণয় এ যুগের মানব-চরিত্রে দুর্নিরীক্ষ্য। আলোচ্য গ্রন্থের সাধুচরিত্র যে আলোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

তাপস-কাহিনী

হজরত আব্দুল কাদের জিলানী

উপরে যে মহাত্মার পবিত্র নাম লিখিত হইল, তিনি করুণাময় বিশ্ব-স্রষ্টার অনুগ্রহে বহু অলৌকিকতা ও সদ্‌গুণ-বিভূষিত হইয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফী-সমাজের শিরোভূষণ এবং জন-সাধারণের পরম ভক্তিভাজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার সাধুতা, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মলিপ্সা অদ্বিতীয় ছিল। তিনি আবাল্য বিশুদ্ধচরিত্র, সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর মাহাত্ম্য, অমানুষিক প্রতিভা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং চিত্তের একাগ্রতা শৈশব হইতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। জিলান নামক জনপদে হিজরী ৪৭১ সালের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মভূমির নামানুসারে তিনি আব্দুল কাদের জিলানী নামে আখ্যাত।

হজরত আব্দুল কাদের জিলানী পবিত্র সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবু সালেহ্ এবং সৈয়দ আবত্তুল্লাহ্ সোমায়ীর তুহিতা বিবি ফাতেমা ছিলেন তাঁহার মাতা। ইঁহারা জীবনের দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। অতঃপর জননীর ষষ্ঠি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হজরত আব্দুল কাদের পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মের পর তাঁহার আব একটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ কবেন, কিন্তু সেই ভ্রাতা যৌবনকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। আল্লাহ্-তা'লা হজরত আব্দুল কাদের জিলানীকে যেমন অনুপম গুণরাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, তেমনি নরলোক-তুর্লভ সুন্দর রূপলাবণ্যও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রূপে-গুণে সুরভিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় মনোজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব ও মধুময় প্রকৃতি দর্শনে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইতেন।

হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর উপর দয়াময় বিধাতার অশেষ অনুগ্রহ ছিল। সেই জন্যই সদ্যপ্রসূত অবস্থাতেই তিনি আপন ধর্ম্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহা যে সেই খোদা-তা'লার লীলাসমুদ্রের তরঙ্গমালার লহরী-বিশেষ, তাহাতে সংশয় নাই। কথিত আছে, তিনি পবিত্র রমজান মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের

অবশ্যপালনীয় রোজা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন; প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাবধি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শত যত্নেও মাতৃস্তন্য পান করিতেন না! পররর্ত্তী কোন সময়ে রমজান মাসে চন্দ্র দর্শনে ব্যাঘাত জন্মে এবং তজ্জন্য সেই রাত্রিতে রোজা-রক্ষার সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সকলের মনে সংশয় জন্মে। কিন্তু নানা বাদানুবাদের পর অনেকে সন্দিগ্ধচিত্তে রোজার সঙ্কল্প করেন। পর দিবস প্রত্যূষকালে একটী মহিলা জিলানী-জননীকে প্রশ্ন করেন যে, কোনও স্থান হইতে চন্দ্র-দর্শনের সংবাদ আসিয়াছে কি না এবং অদ্য রোজা রাখা উচিত কি না? তদুত্তরে তিনি বলেন, "চন্দ্র-দর্শনের কোন সংবাদ পাই নাই বটে, কিন্তু চন্দ্র যে উদিত হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেননা আজ প্রত্যূষ হইতে আমার পুত্র স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে। পবিত্র রমজান মাসে এই শিশু দিবাভাগে কদাচ দুগ্ধ পান করে না। তাই বলিতেছি, চন্দ্র নিশ্চয় উঠিয়াছে, রোজা রাখা কর্ত্তব্য।" এই কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে চন্দ্র-দর্শনের সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই প্রশ্নকর্ত্রী সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং এই দেব-শিশুর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া অশেষ গুণ্-গান করিতে লাগিলেন।

একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, শৈশবকালে যখন তিনি ধাত্রীর ক্রোড়ে থাকিয়া শান্তি-সুখে লালিত পালিত হইতেন, সেই সময়ে এমন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যে, তাহাতে তাঁহার অচিন্তনীয় অলৌকিকতায় বিস্মিত ও চমকিত হইতে হয়। কথিত আছে, তিনি এক দিন অকস্মাৎ ধাত্রীর ক্রোড় হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া সুদূর আকাশমণ্ডলের দিকে দ্রুত ধাবিত হন এবং এত দূরে গমন করেন, যেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্যের নিকটে গিয়া উপনীত হন। সেই নরলোকের অগম্য ভীষণ স্থানে এই জ্যোতির্ম্ময় দেব-শিশু সূর্য্যের সম্মুখীন হওয়ায় আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোকে অধিকতর আলোকিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার স্বর্ণকান্তি শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইয়া সূর্য্যে প্রতিফলিত হইয়া এতাদৃশ চমকিত হইল যে, চতুর্দ্দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃরাশিতে বিদ্যুল্লহরী-লীলায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গেল। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অতীত হইলে পর তিনি পুনর্ব্বার ধাত্রীর ক্রোড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন।* ধাত্রী এই অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে নীরবে প্রস্তর-প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া অপলকনেত্রে চাহিয়া ছিল

* "গোলদেস্তায়ে কেরামত" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এবং অতীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও নিকটে সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মহামহিম মহাপুরুষ জন্মভূমি জিলান পরিত্যাগ করিয়া বাগ্দাদে ধর্ম্মোপদেশ বিতরণে সাধারণের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই কালে উক্ত ধাত্রী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মান সহকারে বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করে, "হজরত! শিশুকালে একদা আপনি আমার ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে সূর্য্যের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন। এক্ষণেও কি সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে?" তিনি বলিলেন,—"ধাত্রি! এক্ষণে সে ভাব আর নাই। সেই সময়ে আমার লঘু দেহ সর্ব্বশক্তিমান্ খোদা-তা'লার বিশ্বব্যাপী বিরাট্ জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে অক্ষম ছিল,—আধার আধেয় ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। সুতরাং সেই মহাজ্যোতিঃ দ্বারা আমি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া যাইতাম—আমার দেহস্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা চঞ্চল হইয়া সেই জ্যোতিরাশিতে গিয়া সংযোজিত হইয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে করুণাময় খোদা-তা'লা আমাকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন—আধার এরূপ প্রসারিত হইয়াছে যে, আর কিছুতেই আমি বিচলিত হই না, আধেয় সম্পোষ্য করিয়া লই। এক্ষণে আমি প্রতিদিনই

সেই মহাজ্যোতিঃ দর্শন করি, কিন্তু তাহাতে আমার চাঞ্চল্য ঘটে না। এক্ষণে আমিই তাহার আকর্ষক হইয়া পড়িয়াছি; আব আমি শূন্যে উত্থিত হই না।”

বয়োবৃদ্ধির সহিত হজরত জিলানী বিদ্যাশিক্ষার্থ নিয়োজিত হন। সপ্তদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি জন্মভূমিতে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা কবেন। অতঃপর তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-লালসা ও বিদ্যাভ্যাস-বাসনা প্রবল হওয়ায় তিনি প্রসিদ্ধ বাগ্দাদ নগবে যাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি জননীর নিকট বাগ্দাদ-গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে সেই বুদ্ধিমতী মহিলা যথোচিত কষ্টবোধ সত্ত্বেও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন এবং গৃহ-মধ্য হইতে ১২০টী দিনাব আনিয়া তন্মধ্য হইতে ৪০টী দিনার তাঁহাব বাহুমূলেব নিম্নভাগে জামার মধ্যে গুপ্তভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়া সময়োচিত উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

এইরূপে তরুণ বয়সে জননীর নিকট বিদায় লইয়া সাহসে নির্ভর করিয়া হজরত জিলানী জন্মভূমি জিলান হইতে বাহির হইলেন। এক দল সওদাগর বাগ্দাদ গমন করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই সহযাত্রীরূপে যাইতে লাগিলেন। সওদাগরগণ একদা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়া উপনীত হইলেন। সন্ধ্যাসমাগম হওয়ায় সকলে সেই স্থানেই রাত্রি যাপনার্থ অবস্থান করিলেন।

হজরতও এক স্থানে শয্যারচনা করিয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অঙ্গ বিস্তার করিলেন। যখন রজনী দ্বিপ্রহর, সকলেই নিদ্রিত, সেই সময়ে সহসা এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইল। কোথা হইতে কতকগুলি ভীষণ দস্যু সওদাগরদের উপর আপতিত হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। অধিকন্তু তাহাদের নির্দ্দয় ব্যবহারে সকলেই যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইলেন।

এই সময়ে সেই সুচতুর তরুণ যুবা ঘোর বিপদ দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ জননীর উপদেশানুসারে একটী 'দোওয়া' (শাস্ত্রোক্ত শ্লোক-বিশেষ) পরম ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি দয়াময়ের অনুগ্রহে তৎপ্রভাবে দস্যুদলের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন,—কেহ তাঁহার কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। তথাপি তাঁহার শ্লোক-আবৃত্তির বিরাম নাই। ইত্যবসরে একটী দস্যু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"দরবেশ! তোমার সঙ্গে কি কিছু আছে?" এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার অন্তরে জননীর উপদেশ জাগরিত হইল। তিনি বিদায়-প্রদানকালে বলিয়া দিয়াছেন,—"বাছা! প্রাণান্তেও সত্যের অপলাপ করিও না।" সুতরাং এই ঘোর বিপন্ন সময়েও তিনি মিথ্যা বলিয়া এক অপরাধ এবং তদুপরি জননীর

আজ্ঞা অবহেলা, এই উভয়বিধ পাপে কি লিপ্ত হইতে পারেন? কখনই না। তিনি প্রশ্নমাত্র অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার কাছে চল্লিশটী দিনার আছে এবং তাহা আমার বাহুমূলের নিম্নে জামাতে আবদ্ধ আছে।"

দস্যু তাঁহার এই কথা বিশ্বাস করিল না, সে অন্য দিকে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে অপর এক জন দস্যু আসিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল, তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় যথার্থ উত্তর প্রদান করিলেন। তৎশ্রবণে সেই দুর্বৃত্ত দস্যুপতির নিকটে গিয়া সমুদয় বিবরণ করিল। দস্যুরাজ তখনই তাহাকে সম্মুখে আনয়ন করিতে অনুমতি করিল। হজরত দস্যুদলের মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দলপতি লুণ্ঠিত দ্রব্য বিভাগ করিতে ব্যস্ত আছে। সে তাঁহাকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—"বালক! তোমার নিকটে কি আছে?" উত্তর পূর্ব্ববৎ। তিনি সেই শত্রুপরিবেষ্টিত ভীষণ স্থানেও সত্য গোপন করিলেন না, অধিকন্তু সেই দিনার বাহির করিয়া দেখাইলেন। দস্যুপতি এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া কহিল,—"যুবক! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ উত্তর দিবে। দেখ, আমরা দস্যু, ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। ধন-রত্নাদি প্রকাশ না করিয়া গুপ্তভাবে রাখাই জন-সাধারণের ধর্ম্ম। কিন্তু

তোমার স্বভাব তাহার বিপরীত দেখিতেছি। তুমি ঐ দিনারগুলি আমাদেব নিকট গোপন বাখলে তোমার পক্ষে ভাল হইত, উহা কেহই লইতে পারিত না। কিন্তু তুমি পূব্বাপর যথার্থ কথাই বলিয়া আসিতেছ। ইহাব কারণ কি, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।” তখন সেই সত্যসেবক ধর্ম্মবীব ইহা শুনিয়া বলিলেন,—“আমার মাতার নিকট আমি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি যে, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কথা কখন বলিব না। সেই জন্যই আমি সত্য গোপন করি নাই, যদি কবিতাম, তবে আজ মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলন জন্য দুবপনেয় পাপে পতিত হইতাম এবং মিথ্যা বলার জন্যও অপবাধী হইতাম। এই উভয় পাতক হইতে নিষ্কৃতি-লাভ জন্যই আমি সত্য-গোপন কবি নাই।”

এই জ্ঞানগর্ভ মধুব কথা শ্রবণ করিয়া দস্যু-দলপতির চিত্ত চমকিত হইল, তাহার শবীবেব স্তরে স্তবে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল! মনে অনুতাপেব উদয় হইল। সে ধীব কাতব বচনে বলিল,—“আপনি জননীব বাক্য অবহেলনে পাপ স্পর্শিবে, এই আশঙ্কায় এই সঙ্কটস্থলে দস্যুর সমক্ষেও সত্য রক্ষা করিলেন। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার জননী! ধন্য আপনাব ন্যায়পবতা! আর আমরা?—ধর্ম্মজ্ঞানহীন চিরপাপরত আমরা? হায়, পাপের প্রলোভনে পড়িয়া সেই পরম দয়াবান্ আল্লাহ্-

তা'লার মঙ্গলময় আজ্ঞা চিরদিন পদদলিত করিতেছি। এই অনিত্য দেহের পোষণার্থ, পুত্র-কলত্রাদির জীবন-রক্ষা জন্য কত লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কত নিরীহ নরের জীবন-সংহার এবং আরও কত অসৎ কার্য্য করিতেছি। হায়, আমাদের ন্যায় নরাধম মহাপাপী আর কে আছে? ধিক্ আমাদের জীবনে, ধিক্ আমাদের কার্য্যে, ধিক্ আমাদের মানব নাম-ধারণে! অহো, পরিণামে আমাদের কি গতি হইবে?"

দস্যু-পতি এইরূপ অনুশোচনার সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার নয়নযুগল হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মুখে বাক্য নাই, ঘন দীর্ঘশ্বাসের বিরাম নাই। অবশেষে দস্যুপতি সদলবলে সেই সত্যব্রত পুণ্যপুরুষের নিকট একাগ্রচিত্তে খোদার নামে শপথ করিয়া আপনাদের ঘৃণিত দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং সওদাগরদের তাবৎ ধন-সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন সেই সাধু-শিরোমণি হজরত জিলানীর সুকৃতিগুণে পাপিগণ নবজীবন লাভ করিয়া ও সওদাগরগণ অপহৃত দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই তদীয় সাধুতায় মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইল। দস্যুদল হজরতের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

কথিত আছে, দস্যুরাজ এইরূপে সদগতি লাভ করিয়া হজরত জিলানীকে আপন আবাসে লইয়া যায়। দস্যুরাজের এক পরমা সুন্দরী অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। দস্যুরাজের অনিবার্য্য অনুরোধে হজরত সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়েই রাখিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থ বাগ্দাদে গমন করেন।

বাগ্দাদে গিয়া হজরত জিলানী উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে আন্তরিক যত্ন ও শ্রমের সহিত বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হন এবং প্রখর প্রতিভাবলে শীঘ্রই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সমগ্র কোর্আন শরীফ এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনানুসারে যে কোন স্থান হইতে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার যশঃ, মান ও জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি শীঘ্রই দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। এই তরুণ বয়সে তিনি সর্ব্বত্র পরম পণ্ডিত ও গভীর তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান প্রচারকার্য্যের দ্বারা সাধারণ্যে বিতরণ করিতে প্রথমতঃ সাহস করেন নাই। পরে ঘটনা-পরম্পরায় তাঁহার বক্তৃতাশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইলে তিনি ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেই

কার্য্য এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী মধুর ভাষায় সম্পাদন করিতেন যে, তাহাতে আপামর জনসাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হইত এবং সমাগত জনসমুদ্র তন্ময় হইয়া নিস্পন্দ জড়পদার্থের ন্যায় স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিত।

এই সময়ে জনৈক সওদাগর বাগ্দাদে আসিয়া উপনীত হন। তিনি মহর্ষির ধর্ম্মকথা শ্রবন-মানসে তাঁহার নিকটস্থ একটী মস্জিদে গমন করেন। তিনি দেখিলেন, সাধকপ্রবর মিম্বরে (বেদীতে) উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিতেছেন, আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক ধীরভাবে বসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। সওদাগরও সেই জনতার মধ্যে বসিয়া হজরতের বাক্যামৃত পান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার শৌচপীড়া এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, উঠিয়া গিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবারও সুযোগ ও শক্তি রহিল না। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি নিরুপায় হইয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ তিনি হজরতের দৃষ্টিপথে পড়িলেন। দর্শনমাত্র সওদাগরের আন্তরিক পীড়া তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং সেই অসহ্য যন্ত্রণার শান্তির জন্য তৎক্ষণাৎ মিম্বর হইতে উঠিয়া আপনার গাত্রাবরণখানি সওদাগরের শরীরে ফেলিয়া দিলেন। লীলাময় বিধাতার কি

অলৌকিক লীলা! সওদাগর সেই গাত্রাবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া দেখেন যে, তিনি এক নির্জ্জন ময়দানের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে নির্ম্মল নির্ঝরিণী ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া বহিতেছে, তীরে বিবিধ বন-বৃক্ষ প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সওদাগর আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় হাতের 'তস্‌বীহ্‌' (জপ-মালা) রাখিয়া শৌচ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং নির্ঝরের পানিতে অঙ্গশুদ্ধি করিয়া তীরে উঠিতেই হজরতের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়-চকিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখেন, কিছুই নাই! কোথায় বা নির্ঝর, কোথায় বা বৃক্ষ, আর কোথায় বা ময়দান! সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার শৌচ-ক্রিয়াও তো মিথ্যা নহে; কিন্তু সে মল-মূত্র কোথায়? উপবেশন-স্থানে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। হাতের তস্‌বীই বা কোথায় রহিল? অনেক সন্ধানেও তাহা আর পাইলেন না! বহু চিন্তার পর এই অপূর্ব্ব ঘটনার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া সওদাগর পুনরায় ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে মনঃসংযোগ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মকথা সাঙ্গ হইলে হজরত আপনার গাত্রাবরণ গ্রহণকালে সওদাগরকে কহিলেন,—"কেমন, আর কোন ক্লেশ নাই তো?" সওদাগর সসম্মানে

অভিবাদন করিয়া উত্তর করিলেন, "হজরতের কৃপাগুণে এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি ; কোন উদ্বেগ নাই। কিন্তু আমার তস্‌বীহ্ পাইতেছি না।" পরে সওদাগর যথোচিত সম্মান প্রদর্শনান্তর হজরতের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি অত্যদ্ভুত ঘটনা! কি বিচিত্র ব্যাপার! সওদাগব নগর হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গমন করিতেই দেখেন, সম্মুখে সেই নির্ঝরিণী ও বিস্তীর্ণ ময়দান এবং ময়দানে সেই তরুরাজি শোভা পাইতেছে। কতিপয় পদ অগ্রসর হইতেই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বৃক্ষশাখায় তস্‌বীহ্ও পাইলেন। সওদাগর এই অলৌকিক ঘটনায় একেবারে বিমুগ্ধ হইলেন। বুঝিলেন, ধর্ম্মোপদেষ্টা সামান্য মানব নহেন। তাহার ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি অগৌণে ফিরিয়া আসিয়া যাবতীয় সহগামী ব্যক্তিসহ সেই পবিত্র পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

হজরত জিলানী স্বয়ং বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যৌবনকালের প্রথম হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল সন্ধ্যাকালীন উপাসনার অজুতেই প্রাতঃকালের নমাজও সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন রজনীতেও তাঁহার অজু ভঙ্গের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। অধিকন্তু তিনি এরূপ এক কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যাকালীন উপাসনার

পর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র কোর্‌আন শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেন। অতঃপর খোদা-তা'লার ধ্যানে এরূপ গভীরভাবে নিমগ্ন হইতেন যে, ক্রমাগত চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার স্নানাহার কিছুই ঘটিত না, কেবল অবিশ্রান্ত যোগ-সাধনেই ডুবিয়া থাকিতেন।

এক সময়ে যখন মহর্ষি অরণ্য-মধ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন এক অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলেন, "আপনি কি কাহারও বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা রাখেন?" তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন,—"হাঁ, যদি কেহ আমার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অগ্রসর হন, তবে আমিও তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।" আগন্তুক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"যদি তাহাই নিশ্চিত, তবে আমি যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি, আপনি এই স্থান হইতে কুত্রাপি গমন করিবেন না।" আগন্তুক ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; হজরত জিলানীও তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবস্থায় দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি আগন্তুকের দর্শন নাই। এক বৎসর গত হইলে পর তিনি দর্শন দিয়া বলিলেন,—"আমি যতক্ষণ না, ফিরিব, ততক্ষণ আপনি এই স্থানেই অপেক্ষা করুন

কোথাও যাইবেন না। আমি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইয়া আপনাব সঙ্গে আপনাব গৃহে গমন কবিব।” ইহা বলিযা সেই অপবিচিত পুরুষ আবাব এক বৎসবেব জন্য অদৃশ্য বহিলেন এব অপাব অধ্যবসাযশীল ঋষিবাজও সেই জনমানবশূন্য ভযঙ্কব বনমধ্যে আগন্তুকেব আগমন-আশায় পিপাসা-পীড়িত চাতকেব ন্যায় চাহিয়া বহিলেন। এক বৎসব পবে এক দিন আগন্তুক উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য-সহ উপস্থিত হইযা প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—“মহোদয়। আমি খেজব, দৈবাদেশে আপনাব সহিত মিত্রতা স্থাপন ও আহাব কবিতে আসিযাছি।”

হজবত জিলানী এই বাক্য শুনিযা মহাপুরুষ খেজবেব যথোচিত সাদব সম্ভাষণ কবিলেন, পবে উভযে একত্রে ভোজন-ক্রিযা সম্পন্ন কবিযা সাযংকাল পর্য্যন্ত সদালাপে অতিবাহিত কবেন। কথিত আছে, হজবত জিলানী এই তিন বৎসব বনমধ্যে কেবল খোদা-তা'লাব ধ্যান-ধাবণায় মগ্ন থাকিযা কোন দ্রব্য ভক্ষণ না কবিযা জীবিত ও দণ্ডায়মান ছিলেন। ধন্য তাঁহাব সহিষ্ণুতা। ধন্য তাঁহাব সাধন-বল।

তপস্বিপ্রবব একবাব খোদাব নামে শপথ কবিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদবধি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ হস্তে তাঁহার মুখে আহার্য্য ও পানীয় তুলিয়া না দিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি কোনক্রমেই পানাহাব করিবেন

না। তদনুসারে নিরম্বু অনাহারে চল্লিশ দিন অতীত হইয়া যায়, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সুস্বাদু খাদ্য আনিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া আহারার্থ আহ্বান করিলেন, সত্যব্রত ঋষিরাজ ক্ষুধা সত্ত্বেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; কিন্তু তাঁহার নফ্‌সের (রসনেন্দ্রিয়ের) অভিলাষ উহা ভক্ষণ করে। তাহাতে তিনি রসনেন্দ্রিয়কে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শাসন করিলেন। নফ্‌স্ পুনঃ পুনঃ খাদ্যপ্রার্থী হইল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

ঘটনাক্রমে সেই স্থান দিয়া প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী মহাত্মা শেখ আবু সঈদ মখ্‌তুমী গমন করিতেছিলেন। তিনি নফ্‌সের কাতরোক্তি শ্রবণে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কাহার করুণ ধ্বনি?" হজরত তদুত্তরে বলিলেন,—"ইহা ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রিয়ের প্রার্থনা। কিন্তু আমার আয়ত্ত আত্মা শান্তভাবে আছে।" তখন শেখ সাহেব ঈষৎ হাসিয়া "আমার সঙ্গে আইস" বলিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু হজরত উঠিলেন না। ইতিমধ্যে মহাত্মা খাজা খেজর দর্শন দিয়া তাঁহাকে শেখ সাহেবের গৃহে যাইবার জন্য বলিলেন। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং তথায় গিয়া দেখেন, শেখ সাহেব তাঁহার অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দর্শনমাত্র বলিলেন,—"প্রিয় আব্দুল কাদের! আমার বাক্য কি তোমার

পক্ষে যথোপযুক্ত ছিল না যে, তজ্জন্য তুমি খেজরের অনুজ্ঞা বিনা স্বস্থান ত্যাগ কর নাই?" ইহা বলিয়া তিনি হজরত জিলানীকে গৃহমধ্যে বসাইয়া অত্যধিক যত্ন-সহকারে স্বহস্তে তুলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। অতঃপর শেখ সাহেব আপনার পবিত্র খের্কা (গাত্রাবরণ) উন্মোচন করিয়া হজরতের বক্ষে বক্ষ লাগাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রসন্ন অন্তরে তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষাদান এবং প্রধান শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

একদা রমজান মাসের সময় সত্তর জন লোক পরস্পরের অজ্ঞাতসারে হজরতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অতঃপর যথাকালে সেই মহিমময় পুরুষ উক্ত সপ্ততি জনের বাটীতেই আহারান্তে উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। পর দিবস নিমন্ত্রণকারিগণের সকলেই কথা-প্রসঙ্গে "হজরত কল্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন," এইরূপ প্রকাশ করায় চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বাস্তবিক এক ব্যক্তির একই সময়ে সপ্ততি জনের বাটীতে আহার ও নমাজ নির্ব্বাহ করা, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও ঘোর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? ফলতঃ বাগ্দাদবাসীরা তাঁহার এইরূপ বহু অলৌকিকতার পরিচয় বিদিত ছিলেন, তজ্জন্য সন্দেহের ছায়ামাত্র কাহারও অন্তর স্পর্শ করিতে

পারে নাই। কিন্তু মহর্ষির জনৈক শিষ্যের মনে এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। হজরত উহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যের মনের ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য নতমস্তকে মনের কথা বলিলে হজরত তাহার সন্দেহভঞ্জন মানসে কহিলেন,—"একবার এই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি!" শিষ্য মস্তকোত্তোলন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও অন্তরাত্মা চমকিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সেই তপস্বিকুল-শিরোভূষণ হজরত জিলানী বৃক্ষের সকল পত্রেই আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন আছেন। বৃক্ষের কি নিম্ন, কি উচ্চ শাখায়, কি মধ্যভাগে, কি পার্শ্বদেশে, সর্ব্ব স্থানের পল্লবেই সেই মোহন মূর্ত্তি বিরাজিত, সর্ব্বত্রই হজরত ধ্যানমগ্ন! কি অপরূপ দৃশ্য! কি অলৌকিক ঘটনা! শিষ্যের সন্দেহ তখনই দূর হইল। তিনি গুরুর উপর অধিকতর আস্থাবান্ হইয়া ভীতচিত্তে কম্পিত কলেবরে তাঁহার পদানত হইয়া করুণকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদা দুঃসহ গ্রীষ্মের জন্য হজরত গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া সমবেত লোকদিগকে উপদেশ দান করিতেছিলেন। সেই সময়ে একটী চিল সভামণ্ডপের উপরিভাগে নিয়ত উড্ডীয়মান হইয়া কর্কশ চীৎকার করিতে লাগিল। একে ভয়ানক গ্রীষ্ম, তাহাতে আবার চিলের চীৎকারের

বিরাম নাই'। হজরত স্বয়ং এবং শ্রোতৃবৃন্দ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চিল কিছুতেই স্থানান্তরে উড়িয়া গেল না, মস্তকোপরি চক্রাকারে উড়িয়া ক্রমাগত নীরস নিনাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে হজরত সেই দুর্ভাগ্য বিহঙ্গমের উপর অভিশাপ-অসি নিক্ষেপ করিলেন। তখনই পক্ষী ছিন্নমস্তকে ভূপতিত হইল এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উল্লম্ফন করিতে লাগিল। পক্ষীর দারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে হজরতের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অগৌণে গাত্রোত্থান করিয়া পক্ষীর দেহে তাহার ছিন্ন মস্তক সংযোগ করিয়া দিলেন এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' পাঠ করিয়া পক্ষীর উপর ফুৎকার দিতেই ভক্ত-মনোরঞ্জন খোদা-তা'লার অনুগ্রহে চিল তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল। চিল তখন স্বীয় স্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

হজরত জিলানী কোন সময়ে এক নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অশান্ত তরঙ্গমালার অনর্গল উত্থান-পতন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন আর সেই সর্ব্বলীলা-মূলীভূত খোদা-তা'লার অপার মহিমা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, নিকটস্থ পল্লী হইতে কয়েকটী মহিলা পানি গ্রহণার্থ নদীতে আসিল। রমণীগণ সকলেই একে একে পানি লইয়া প্রস্থান করিল; কেবল একটী

বৃদ্ধা সর্ব্বপশ্চাতে থাকিয়া আর গৃহে গমন করিল না। সে আপন কলসী জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিয়া করুণ-কাতরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তাহার হৃদয়ভেদী গভীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল! হজরত জিলানী বৃদ্ধার হাহাকার-ধ্বনি শ্রবণে বিচলিত হইলেন; তাঁহার কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া গেল। তিনি বৃদ্ধার জনৈক প্রতিবাসীকে ডাকিয়া তাহার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধার এক মাত্র পুত্র নদী-পারস্থিত একটী গ্রামে বিবাহ করিতে গমন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পুত্র বিবাহান্তে নব বধূ লইয়া আত্মীয়-স্বজন-সহ যখন এই নদী পার হইতেছিল, সেই সময়ে প্রবল ঝটিকায় তরঙ্গ উত্থিত হওয়ায় বর-বধূ ও বরযাত্রিগণ যাবতীয় সাজসজ্জাসহ জলমগ্ন হয়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; তদবধি এই বৃদ্ধা প্রতিদিন এই নদীতে জল লইতে আসে এবং প্রিয়তম পুত্রকে স্মরণ করিয়া এইরূপে কিয়ৎক্ষণ শোক প্রকাশ করিয়া গৃহে গমন করে।

হজরত মন্দভাগিনী বৃদ্ধার নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দয়ার সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি লোক দ্বারা বৃদ্ধাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—“শান্ত হও, অশ্রু সম্বরণ কর, আর অনুতাপ করিও না। তোমার পুত্র-শোক দমন

করিয়া আল্লাকে স্মরণ কর। খোদা-তা'লার অনুগ্রহ হইলে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। হয়তো তুমি তোমার পুত্রকে নব বধূ সহ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেও পার।" পবিত্র পুরুষ এই প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইয়া প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করত নদীতে নিমজ্জিত ব্যক্তিবর্গের পুনর্জীবন দান জন্য একাগ্রচিত্তে সেই পরাৎপরের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। মোহান্ধ জগৎ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, প্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! প্রেমিক-হৃদয়ের কি অদ্ভুত আকর্ষণ! ভক্তাবতার হজরত জিলানীর আহ্বানে প্রেমময়ের আরশ টলিল! কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই হজরতের তপঃপ্রভাবে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ও অনুজ্ঞায় বর-বধূ, সহযাত্রি লোক ও সজ্জাদি সহ সেই নৌকা নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া তীরসংলগ্ন হইল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! প্রেমিকের কি অসীম শক্তি! সেই শক্তিপ্রভাবে জগতে যে এতাদৃশী কত অত্যদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ঘটনা সমাহিত হইতে পারে, তাহা কে জানে? তত্ত্বজ্ঞানহীন, স্বল্পধী, সদা সন্দেহাকুল পাপী মানবের তাহা দেখিয়া-শুনিয়াও কি তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা আছে?

বৃদ্ধা অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক অনুতাপ করিয়াছে, অনেক অযৌক্তিক প্রলাপে আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে।

এই দীর্ঘকাল তাহার রোদন, অনুতাপ ও অনুযোগের আর বিরাম ছিল না ; কিন্তু আজ তাহার সকল দুঃখের শেষ হইল, সকল উদ্বেগের অবসান হইল। সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বপতির প্রসাদে আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই ; আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আজ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। সে হজরতের তপশ্চর্য্যা ও জগৎপিতার অপার মহিমা যুগপৎ চিন্তা করিয়া বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে প্রফুল্লবদনে আল্লাহ্-তা'লাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া হজরতের গুণানুবাদ করিতে করিতে সে পুত্র ও পুত্রবধূ সহ গৃহে গমন করিল।

এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কথিত আছে, অনেক পথভ্রান্ত লোক তৎশ্রবণে স্বেচ্ছায় হজরতের নিকটে আসিয়া শাস্ত্রসম্মত প্রথানুসারে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

তপস্বিকুলের অগ্রণী মহামহিম হজরত আব্দুল কাদের জিলানী হিজরী ৫৬১ সালের ১১ই রবিয়লআউয়ল তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী সুখরাজ্যে প্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল ; তাঁহার দশটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কন্যাটীর মৃত্যু ঘটে। হজরত জীবনের প্রথম অষ্টাদশ বৎসর জন্মভূমি জিলানে অতিবাহিত করেন ;

তৎপরে সাত বৎসব কাল বিদ্যাশিক্ষার্থ, পবিত্র বাগদাদ নগরে বাস করিতে বাধ্য হন। পঁচিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঋষিপ্রবব খোদা-তা'লাব ধ্যান-ধারণায় নির্জ্জন-নিবাস করেন। অনন্তর ৪১ বংসর হইতে মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত লোক-সাধাবণেব মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া বেড়ইয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তিম সময়ে তিনি আপন পরিবারবর্গ, শিষ্যমণ্ডলী ও পবিচারকগণকে একত্র কবিয়া সদুপদেশ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ কবেন। পরে সাময়িক নমাজ সমাপনান্তে লম্বিতভাবে শয়ন কবিয়া পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে কবিতে বাগদাদবাসীদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, জগৎ অন্ধকাব করিয়া সেই পবিত্র পুরুষ ইহলৌকিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন কবেন।

বাগদাদের যে স্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ কবা হয়, তাহার নাম "মাদ্রাসা মায়াল্লা বাবল্ আজাজ্।" এই স্থান সেই পবিত্র দেহের সংস্পর্শে পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য যাত্রিবৃন্দের নয়নমনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

নিজামউদ্দীন আউলিয়া

ভারতীয় মুসলমান তাপসবৃন্দেব মধ্যে হজবত নিজামউদ্দীন আউলিয়া এক জন উচ্চ শ্রেণীব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। "সোলতান-উল্-মশায়েখ" নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্গুণ ও সাধুতা প্রভাবে এক সময়ে দিল্লী ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সুবভিত, গৌববান্বিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বহু দিবস হইল, সেই তাপসপ্রবব ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাব মধুময় নাম শ্রবণে লোকে এখনও অবনতমস্তকে তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কবিয়া থাকেন এবং তাঁহাব পবিত্র সমাধি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

সেই সাধু-প্রবর এদেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদি অধিবাস-ভূমি এদেশ নহে। তাঁহার পূজনীয় পিতামহ খাজা আলি বোখারী বোখারার অধিবাসী ছিলেন। বোখারা স্বাধীন তাতার, তুর্কস্থান বা তুরাণের অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। এই নগরী তৎকালে মুসলমান-গৌরবের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল। এখানে ইস্লামের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্মিতমুখে শুভ্র কিরণ বিতরণ করিত। ইহার বিদ্যোন্নতি ও

শিল্পবাণিজ্যের তুলনা ছিল না। নগরী সুদৃশ্য সৌধাবলী-সমাকীর্ণ; ইহাতে ৩৬০টী মস্‌জিদ এবং ততোধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আজিও ইস্‌লামের প্রবল ধর্ম্মভাব ও বিদ্যানুরাগিতার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। খাজা আলি বোখারী এই উন্নত জনপদের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি হীন ছিল। তিনি অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাই তিনি অবস্থার উন্নতি-বিধান মানসে—ভাগ্যাকাশে সুখ-সূর্য্যের অভ্যুদয়ের আশায় সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ধনধান্যপূর্ণ ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন।

এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রবীণ খাজা সাহেব সর্ব্বদুঃখহারী, সুখ-বিধানকারী আল্লার নাম স্মরণ পূর্ব্বক তরুণবয়স্ক পুত্র ও পরিবার সহ অবিলম্বে বোখারা হইতে বহির্গত হইলেন এব অতি কষ্টে পর্ব্বত-প্রান্তর, বনভূমি, নদ-নদী অতিক্রম করিয়া লাহোরে আসিযা উপস্থিত হইলেন। লাহোরে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া দেখিলেন, তিনি যে উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখানে থাকিলে তাহা সফল হইবার আশা আদৌ নাই। সুতরাং আবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, বদাউন একটী জনপূর্ণ উন্নতিশীল নগর, তথায় গমন

করিলে অর্থাগমের সুযোগ ঘটিতে পারে, ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক তিনি সপরিবারে বদাউন যাত্রা করিলেন।

চিরদিন কখনও সমান যায় না। গভীর অমা-রজনীর পর উষার উজ্জ্বল আলোক অবশ্যই জগতের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। যাঁহার অপূর্ব্ব অচিন্ত্য কৌশলে সংসার-চক্র প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, ইহা সেই করুণাময় বিধাতার কার্য্য। তিনি দাতা ও প্রার্থনা-পূর্ণকারী। যিনি সৎপথে থাকিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার অভাব অনটন ঘুচিয়া গিয়া স্বচ্ছলতা ও শুভাদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধ খাজা আলী বোখারী বদাউন নগরে আসিয়া একটী কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহার কষ্টের অবসান হইল। তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পুত্র-কলত্র লইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

খাজা সাহেবের সংসারের একমাত্র অবলম্বন প্রিয় পুত্র খাজা আহ্‌মদ দানিয়াল। খাজা আহ্‌মদ দানিয়াল শিষ্ট, শান্ত ও পিতৃ-অনুগত ছিলেন। বৃদ্ধ আলী বোখারী প্রিয়তম পুত্রের শিক্ষার দিকে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার জন্মভূমি বোখারা পরিত্যাগ করিয়া আসার পর ভারতে প্রায় সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে দানিয়াল দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। খাজা আলী ভাবিলেন, "আমার তো বার্দ্ধক্যদশা, শরীরের সামর্থ্য ক্রমশঃ হীন

হইয়া আসিতেছে। কোন্ দিন কি ঘটে, বলা যায় না। সুতরাং আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে পুত্রের বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।” ইহা স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বে এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের একটী সুলক্ষণা সুশীলা কন্যার সহিত পুত্রের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া খাজা আলী বোখারী নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছু দিনের মধ্যেই যাবতীয় পার্থিব চিন্তার হস্ত হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল, তিনি প্রিয় পরিবার ও আত্মীয় বান্ধবদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকযাত্রা করিলেন। তখন তরুণ দানিয়ালের উপর সংসারের সমস্ত ভার পড়িল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন? তাঁহার সে ভার বহন করিবার এ জগতে তিনি ভিন্ন আর কেহ সহযোগী ছিল না। স্থিরধী দানিয়াল যদিও এই সময়ে বদাউনের কাজীর পদে আসীন ছিলেন, তথাপি পিতৃবিয়োগে চিন্তিত চিত্তে করুণাময় আল্লাহ্-তা'লার উপর নির্ভর করিয়া স্নেহময়ী জননী ও সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণীর সহিত দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইয়া গেল; যুবক দানিয়াল বুদ্ধিমতী মাতার সুশৃঙ্খলা হেতু ও প্রিয়ভাষিণী

প্রেয়সীর প্রীতি-সম্ভাষণে এই জ্বালাযন্ত্রণাময় দুঃখের সংসারে সুখ-সম্ভোগের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা; বৃদ্ধা জননী পৌত্র-মুখ দর্শন করিবেন বলিয়া পরমানন্দিতা ও আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে ৬৩৪ হিজরী সালে দানিয়ালের অন্দরমহল আলোকিত করিয়া এক পরমসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। মাতা, পিতা, পিতামহী এবং প্রতিবেশিবর্গ শিশুর কমনীয় কান্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন। এই মহান্ শিশুই পরিণামে হজরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া জরিজার-বখ্শ্ নামে অভিহিত হইয়া অলৌকিক সাধুতা ও গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

যে বৎসর নিজামউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন, দিল্লীর সম্রাট শাম্স্উদ্দীন আল্তমাশ ও হিন্দুস্থানের অন্যতম সিদ্ধ পুরুষ কুতবউদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী ঠিক সেই বৎসরই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তপস্বী কুতব-উদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী অলৌকিক তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ছিলেন। তাঁহার গভীর তত্ত্বকথা ও অপূর্ব্ব ধ্যান-ধারণার বিষয় আলোচনা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয়-মন বিস্ময়-রসে প্লাবিত হইয়া থাকে। সেই দিন এক দিকে যেমন তাঁহার তিরোভাব, অপর দিকে তেমনি আবার ধর্ম্মবীর খাজা নিজামউদ্দীনের

আবির্ভাব—সূর্য্যের অস্ত গমন ও তৎপরেই শ্বেতরশ্মি শশধরের উদয়! সুতরাং ধরাতল যে তমসাবৃত হইবে, সে অবস্থা তখন ঘটে নাই। ফলতঃ ইহাও যে করুণাময় বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা ও অপার অনুগ্রহ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিজামউদ্দীন দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মাতার আদরে এবং পিতামহীর ততোধিক যত্নে শিশুর লালন-পালনকার্য্য সুচারুরূপেই হইতে লাগিল। কিন্তু এই স্নেহ—এই যত্ন তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। যখন তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতা খাজা আহ্‌মদ দানিয়াল ও স্নেহময়ী পিতামহী পরলোকে গমন করিলেন—তিনি অকালে তাঁহাদের স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এইরূপ অনাথ অবস্থা যে কেবল তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; জগতের মহাপুরুষদিগের অনেকেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। বিশ্বপাতার ইহাও এক বিচিত্র লীলা!

এক্ষণে সংসারে নিজামের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে একমাত্র মাতা বিবি জোলেখা ব্যতীত আর কেহই রহিলেন না। বিবি জোলেখা অতি বুদ্ধিমতী ও সুশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি দুঃখের অবস্থাতেও প্রাণাধিক

পুত্রকে সর্ব্বাধিক যত্নে প্রতিপালন এবং কৌশলের সহিত তাঁহার সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিজামউদ্দীন অতি বুদ্ধিমান্ বালক ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বার বৎসর বয়সে পবিত্র কোর্‌আন ও হাদীস্ শরীফ আয়ত্ত করিয়া আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করত শিক্ষিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ অতি প্রবল ছিল এবং তন্নিবন্ধন তিনি স্নেহময়ী মাতার সহিত তদানীন্তন শিক্ষা, সভ্যতা, সদাচার ও সর্ব্ববিষয়িণী উন্নতির কেন্দ্রভূমি গৌরবময়ী দিল্লী নগরীতে গমন এবং তথায় অবস্থান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই শিক্ষানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগও অতীব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক বলিয়া ধনীর প্রাসাদ হইতে দীনের কুটীর পর্য্যন্ত সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে দিল্লীতে কাজীর পদ শূন্য হয়। বাদশাহ্ জনৈক চরিত্রবান্, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে নিজামউদ্দীনের উপর পতিত হয়। মন্ত্রিবর বাদশার নিকট নিজামউদ্দীনের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে

দরবারে আনয়ন করিলেন। বাদশাহ্ তাঁহার অনন্যসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকেই এই সম্মানিত কাজীর পদ প্রদান করিলেন।

দিল্লীর কাজীর পদ-প্রাপ্তি—বিচার-বিভাগের উচ্চাসনে উপবেশন, বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। দরিদ্র নিজামউদ্দীন বাদশাহ্ কর্তৃক সেই সর্ব্বজন-স্পৃহনীয় পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই সুসংবাদ জননীর কর্ণগোচর করিলেন। পুত্রের সম্মান ও কুশল-কথা শ্রবণ করিলে কোন্ জননী না আনন্দিত হইয়া থাকেন? দুঃখিনী নিজাম-জননী বিবি জোলেখা পুত্রের উচ্চ পদ লাভের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং ইহা বিধাতার অনুগ্রহ জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু লীলাময় বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় অন্য রূপ; তাই সহসা নিজামউদ্দীনের ভাগ্যফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহার সুধামাখা উপদেশ শত শত শোকী-তাপীর তাপ বিদূরিত হইবে, যিনি অসংখ্য পথভ্রান্ত নরনারীকে পুণ্যের পথ দেখাইবেন, তিনি তুচ্ছ পার্থিব উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়া অনিত্য সুখে মগ্ন থাকিবেন, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তিনি সেই দিনই কোন কার্য্য ধর্ম্মতঃ তাপসকুলরত্ন হজরত খাজা কুতবউদ্দীনের

পবিত্র সমাধির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় দরবেশ আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"নিজামউদ্দীন! তুমি নগণ্য কাজীর পদ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছ! ছি ছি, তোমার কি ভ্রম! আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি ধর্ম্মজগতের অধিপতি হইয়া তত্ত্বোপদেশ-অস্ত্রাঘাতে কুক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করিবে, ধর্ম্মবীর নামে গৌরবান্বিত হইবে; কিন্তু হায়, তোমার কি জঘন্য রুচি!"

নিজামউদ্দীনের কর্ণে এই কথা প্রবেশমাত্র তিনি দরবেশের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব ঘটনা! দরবেশ অদৃশ্য! নিজাম সহস্র যত্নেও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নানা চিন্তায় অভিভূত হইলেন, অন্তরে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন,—"কাজীর পদ সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ পদ বটে, কিন্তু এ পদে উপবেশন না করিতেই দৈব প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। সুতরাং এই পদ আর কোন ক্রমেই গ্রহণীয় নহে।" এই স্থির করিয়া তিনি গৃহে গমন পূর্ব্বক মাতাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সেই সরলা মহিলা পুত্রের কথা শুনিয়া অবাক্, ক্ষোভে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, অন্তর নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আত্মীয়বন্ধুগণ নিজামকে কত প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না,—অযাচিতরূপে

প্রাপ্ত উচ্চ পদ পরিত্যাগ করিলেন। লোকে তাঁহার অপূর্ব্ব আচরণে অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজামের চিত্ত অবিচলিত—বিকারশূন্য। তিনি বদাউনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার জননী পুণ্যবতী জোলেখা বিবি পরলোকগমন করেন।

মাতৃবিয়োগে নিজামউদ্দীন অন্তরে অতীব আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সুখ-শান্তি তিরোহিত হইল। তিনি ম্রিয়মাণ ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন আবুবকর কাওয়াল নামক এক ব্যক্তি নিজামউদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। তিনি দেশ ভ্রমণান্তে বদাউনে আসিয়াছিলেন এবং নিজামেব নিকট আপনার ভ্রমণকাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে অযোধ্যাবাসী হজরত খাজা ফরিদউদ্দীন মস্উদ শকরগঞ্জের তপোমহিমা, ধ্যান-ধারণা ও অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিতেই নিজামউদ্দীনের অন্তর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল—প্রেম-ভক্তির কি এক অপূর্ব্ব শক্তি তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভ এবং তদুপদেশে পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ করণার্থ অধীর হইয়া পড়িলেন। শয়নে, স্বপনে, উঠিতে বসিতে সেই মহাপুরুষের পবিত্র নাম জপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম জন্মভূমির মায়া-মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক

সেই শুভ্রকর্ম্মা সাধু ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জের দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন।

নিজাম একাকী পদব্রজে চলিতেছেন। মনে শান্তি নাই, হৃদয় উদাসভাবে ভরা, পথ অপরিচিত। লক্ষ্য কেবল সেই মহাপুরুষ—তাঁহার কথা মনে করিতেছেন এবং চঞ্চল চরণে পথ অতিক্রম করিতেছেন। এইরূপে বহু কষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সেই মহাপুরুষের পবিত্র নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, হৃদয়ের বিষণ্ণতা দূরে গেল, মলিন মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি হস্তদ্বয় উর্দ্ধ দিকে উঠাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"হে খোদা-তা'লা! তুমি নিঃসহায়ের সহায়, দরিদ্রের আশ্রয়স্থান। তোমার কৃপায় আজ আমি এই দূর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো, যেন আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, বাঞ্ছিত ধন লাভে যেন আমি বঞ্চিত না হই, ইহাই এ দীনের কাতর প্রার্থনা!"

হজরত ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জ তৎকালে হিন্দুস্থানে ইসলাম-ধর্ম্ম-জগতের [illegible]। দিল্লীর স্বর্ণ-সিংহাসনাসীন প্রবলপ্রতাপ শাহান্‌শাহ্ বাদশাহ্ হইতে আমীর-ফকীর সকলেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস-স্থল—সাধন-কুটীর অতি ক্ষুদ্র এবং আড়ম্বরবিহীন। ফলতঃ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মত্ত দরবেশদিগের কি বাহ্যাড়ম্বরের দিকে খেয়াল থাকে? যাহা হউক, খাজা নিজামউদ্দীন ধীরপদে সেই পুণ্য কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন—মনে কত ভাব, কত ভয়, কত চিন্তা! কিন্তু কি শুভ মুহূর্ত্ত! কি মধুর মহামিলন! হজরত শেখ ফরিদউদ্দীন নির্ম্মলচিত্ত নিজামকে দর্শনমাত্র হাস্যমুখে একটী কবিতা উচ্চারণ করিলেন। সেই কবিতার মোহনীয় ভাব তীরের ন্যায় শকরগঞ্জের রসনা হইতে নিজামউদ্দীনের হৃদয়ের অন্তস্তল বিদ্ধ করিল। নিজাম মুগ্ধ—তন্ময় হইয়া গেলেন, তাঁহার অন্তরে কি যেন এক মধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—নয়নে কি এক বিশদ ভাব পরিদৃশ্য হইল। তিনি যথারীতি ভক্তি ও সম্মানসহ সাধুবরের চরণে 'বোসা' (চুম্বন) দিলেন, তিনিও সহাস্যে নিজামের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, নিজামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই সময়ে নিজামউদ্দীন বিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন।

নিজাম গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা-লাভ করিতে লাগিলেন। একেই তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অধিকতর উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল—তাঁহার অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত ও মাধুর্য্যময় হইল। কিয়দ্দিবস গুরুগৃহে থাকার পর

গুরুদত্ত 'খের্কা-খেলাফত' গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মহাড়ম্বরময়ী সম্পদ-গৌরবে স্ফীত রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। একদা কে যেন অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—"গিয়াস্‌পুরে গমন কর।" তিনি সেই দৈব আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াস্‌পুরেই আপনার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গিয়াস্‌পুর দিল্লী হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

গিয়াস্‌পুরে সাধনকুটীরে নিজামউদ্দীন দিবারজনী ধ্যানমগ্ন থাকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার সাধুতা ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; বহু লোক তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ও উপদেশ শ্রবণে জীবন সার্থক করণার্থ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে একদা তাপসপ্রবরের ও তাঁহার শিষ্যগণের অতিশয় খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহারা বার মাস রোজা-ব্রত পালন করিতেন। তাঁহাদের সেই রোজা একাদিক্রমে কতিপয় দিবস রাত্রিদিবায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল—দিবসে নিরম্বু উপবাসের পর রাত্রিতেও তাঁহারা উপবাসী থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, এমন কি চতুর্থ দিবসে সন্ধ্যা-সমাগমেও রোজা-ব্রত ভঙ্গের পর ভোজনার্থ কোনও দ্রব্য তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। কি ভয়ানক

বিড়ম্বনা! কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিকারহীন! চিত্ত অনাবিল—অচঞ্চল! নিয়ত খোদা-তা'লার আরাধনা ব্যতীত অন্য দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না।

একটী ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা নারী তাপসপ্রবরের আবাস-গৃহের নিকটে অবস্থান করিতেন। চরকায় সূতা প্রস্তুত করিয়া তৎবিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত। একদা সেই পুণ্যবতী শুনিলেন যে, দরবেশ ও তাঁহার শিষ্যগণ অনশনে কষ্টভোগ করিতেছেন। তখন সেই দয়াবতী মহিলা দেড় সের ময়দা লইয়া গিয়া দরবেশের চরণোপান্তে রাখিয়া গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। রমণীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল, নিজামউদ্দীন তাহা নিজের জন্য নহে, কিন্তু অভ্যাগত অতিথির জন্য স্বীয় প্রিয় সহচর শেখ কামালউদ্দীন ইয়াকুবকে রন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। খাদ্য যথাবিধি রন্ধন হইতেছে, এমন সময়ে এক কম্বলাবৃত তেজস্বী দরবেশ আসিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—"নিজাম! যে কোন খাদ্য-সামগ্রী থাকে, আনয়ন কর।" তিনি কহিলেন—"ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, খাদ্য রন্ধন হইতেছে, রন্ধন হইলেই খাইবেন। দরবেশ কহিলেন,—"না—না, বিলম্ব সহ্য হইতেছে না, তুমি উঠ এবং যেরূপ রন্ধন হইয়াছে, তদবস্থায় পাত্রসহ আমার নিকট আনয়ন কর।" নিজাম-উদ্দীন অবনত মস্তকে তাহাই করিলেন,—অগ্নির উপর

হইতে খাদ্যপূর্ণ পাত্র আনিয়া আগন্তুক দরবেশের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দরবেশ পাত্রের মধ্য হইতে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত আহার্য্য বাহির করিয়া লইয়া অম্লান বদনে খাইতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তাঁহার হাতে কিংবা মুখে অণুমাত্র তাপ অনুভূত হইল না। দরবেশ ইচ্ছানুযায়ী খাইয়া পাত্র সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, পাত্র চূর্ণ হইয়া গেল এবং অবশিষ্ট খাদ্য ছড়াইয়া পড়িল! পরে দরবেশ গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"নিজাম! আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপ মহারত্ন শেখ ফরীদের নিকট তুমি পাইয়াছ; আমি তোমার বহির্জগতের আবরণ (এফ্‌লাসের হাঁড়ী) ভগ্ন করিলাম, তুমি এক্ষণে অন্তর ও বাহির উভয়বিধ তত্ত্বরাজ্যের অধিপতি হইলে।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবেশ অদৃশ্য হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তে কি যেন এক অপূর্ব্ব মায়ার খেলা ঘটিয়া গেল। সকলেই অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। ফলতঃ এই ঘটনার পর হইতেই মহর্ষি নিজামউদ্দীনের মহিমা-গৌরব,—সাধুতার উজ্জ্বল আলোক চতুর্দ্দিকে অধিকতর বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাঁহার সমাদর ও সম্মানের সীমা রহিল না। প্রতিদিন লোকে দলে দলে তাঁহাকে সন্দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে এবং কত উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া তাঁহার

কুটীর-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। নিয়ত লোকসমাগম-হেতু গিয়াস্‌পুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে একদা তাৎকালিক দিল্লীর বাদশাহ্‌ মাজউদ্দীন কায়কোবাদ তথায় একটী নগর স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফলে স্বয়ং বাদ্‌শাহ্‌ ও আমীর-ওমরাহ্‌গণ সর্ব্বদা গতিবিধি করায় সেই নিস্তব্ধ পুরী শীঘ্রই কোলাহলপূর্ণ হইল।

তাপস-প্রবরের সাধন-কুটীরে বহু শিষ্য ও বিদ্বান্‌ লোক নিয়ত অবস্থিতি করিতেন। তদ্ভিন্ন অনেক দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল লোকের আহারাদির জন্য তিনি নিত্য যে সকল ভেট পাইতেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রত্যহ বিস্তর অর্থ-ব্যয় হইত। কথিত আছে যে, রোজ দশটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া খাদ্য-সামগ্রী আনিতে হইত। ফকীর নিজামউদ্দীন এ ব্যয় কোথা হইতে করেন? কোথায় এত অর্থ পান? বাদশাহ্‌ মোবারক খিল্‌জীর মনে একদা এই প্রশ্নের উদয় হয়। মোবারক অতি নিষ্ঠুর ও নীচ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন; ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে তাঁহার কলঙ্ককাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি রাজ্য নিষ্কণ্টক করণার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খেজের খান ও সাদী খানকে নিহত করিয়াছিলেন। এই নিহত ভ্রাতৃদ্বয় তাপস-প্রবরের

শিষ্য ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় গুরুর প্রতিও তাঁহার বিজাতীয় কোপ জন্মে। কিন্তু প্রকাশ্যে তৎপ্রতি অণুমাত্র অত্যাচার করিবার যো ছিল না; কেননা, সভাসদ্‌বর্গ ও সৈন্যগণ সকলেই মহর্ষির ভক্ত শিষ্য। যদি কিছু করেন, তবে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে, এই ভাবিয়া চতুর মোবারক ছলান্বেষণ করিতে থাকেন। অবশেষে জানিতে পারেন যে, তাঁহার সভাসদ্ ও সৈন্যগণই দরবেশের এই ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। মোবারক ইহা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন এবং হুকুম প্রচার করিলেন যে, অদ্য হইতে যে কেহ দরবেশ নিজামউদ্দীনের নিকট যাইবেন বা ভেট ও অর্থাদি দিবেন, রাজকোষ হইতে তাঁহার বেতন বন্ধ করা হইবে। সকলে এই আদেশ শুনিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুর্ম্মতি মোবারকের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ মূর্খ মোবারক ভাবিয়াছিল যে, এতদ্দ্বারা তাপসকে না জানি কত কষ্ট ও কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পাপমতি জানে না যে, যাঁহারা খোদা-তা'লার প্রিয়, নিয়ত তপশ্চাচরণে নিরত, সেই সৎকর্ম্মশীল সাধুদিগকে কি কোন দুর্ম্মতি মানব কষ্টে পাতিত করিতে পারে? কোন ক্রমেই নহে। মহর্ষি মোবারকের ধৃষ্টতার সংবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য

করিলেন এবং প্রিয় সেবক খাজা একবালকে কহিলেন, “আজ হইতে দৈনিক ব্যয় জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা তুমি মঙ্গলময় খোদা-তা'লার নাম লইয়া এই তাক হইতে গ্রহণ করিও।” একবাল তাহাই করিতে লাগিলেন। কি অলৌকিক ঘটনা! তপস্বীর তপোমাহাত্ম্যে প্রতিদিনের ব্যয়ের অর্থ সেই তাক হইতে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। মোবারক তৎশ্রবণে মৌন ও বিষণ্ণ হইলেন।

একদা সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জী তাপসবরকে আপন মহলে আনিবার জন্য এক ব্যক্তিকে এইরূপ বলিয়া প্রেরণ করিলেন,—“আলেক খানকে বহু সৈন্য দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তাঁহার সাহায্যার্থ আরও সৈন্য পাঠাইব কি না, তাহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্যও যদি আপনি আমার মহলে শুভাগমন করেন, তবে আমার চিত্তের শান্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধিত হইতে পারে।” দরবেশ নিজামউদ্দীন বাদশার ইচ্ছা অবগত হইয়া কিছুক্ষণ মুদিত নেত্রে চিন্তা করিয়া কহিলেন, “সুলতানকে বলিও, আমার বাদশার দরবারে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই এবং সুলতানের চিন্তা করিবারও কোন কারণ নাই।

আলেক খান আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে বিজয়-গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি সসৈন্যে ফিরিবেন ; কল্যই এই শুভ সংবাদ বাদশাহ্ পাইবেন।" আলাউদ্দীন এই আনন্দের কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যে মুহূর্ত্তে এই সুসমাচার তাঁহার নিকট পৌঁছিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা তাপসবরকে উপঢৌকন প্রেরণ করিবেন। ফলতঃ সাধুদিগের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। প্রকৃতই পর দিবস যুদ্ধ-জয়-সংবাদ বাদশার গোচরীভূত হইল, তিনি আনন্দে দরবেশ নিজামউদ্দীনের প্রশংসা করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা তাপস-প্রবরের নিকটে প্রেরণ করিলেন। যখন বাদশার লোক মুদ্রা লইয়া পৌঁছিলেন, সেই সময়ে ইস্‌কেন্দিয়ার নামক জনৈক দরবেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দেখিবামাত্র হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক অর্দ্ধেক আপনার দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ইহা আমাকে দান করুন।" দরবেশ নিজামউদ্দীন কহিলেন, "অর্দ্ধেক কেন? তুমি সমস্তই গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত মুদ্রাই প্রদান করিলেন। এই ঘটনা হইতে তপস্বী নিজামউদ্দীন 'জরিজার বখ্‌শ্' নামে আখ্যাত হইলেন।

একদা এক জায়গীরদারের গৃহ অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়া

যায় এবং তৎসহ জায়গীরের ফরমানও ভস্মে পরিণত হয়। তিনি রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া বাদশাহ্-দরবার হইতে ফরমান পুনর্ব্বার হস্তগত করেন। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তাহা আবার হারাইয়া ফেলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, ফরমান নাই, তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধানে রত হইলেন। কিন্তু কোথাও না পাইয়া অবশেষে খাজা নিজাম-উদ্দীনের নিকট গিয়া আপনার দুঃখের কথা কহিলেন। তাপসরাজ সহাস্যে আগন্তুককে কহিলেন, "যদি তুমি ফরমান প্রাপ্ত হও, তবে হজরত ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জকে কিছু 'নজর' দিবে কি না?" তিনি কহিলেন, "যদি সেইরূপ সৌভাগ্যই হয়, তবে নিশ্চিতই নজর দিব।" তখন সাধুবর তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "যাও, এখনই কিছু হালুয়া খরিদ করিয়া লইয়া আইস।" তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ দোকানে গিয়া হালুয়া ক্রয় করিলেন। দোকানদার হালুয়া ওজন করিয়া এক খণ্ড কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে বাঁধিতে লাগিল। ক্রেতা সেই কাগজের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিলেন, উহা তাহারই ফরমান!

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহা যে ধর্ম্মাত্মা

নিজামউদ্দীনের অলৌকিক মহিমার কার্য্য, তাহা অনুভব করিলেন। অতঃপর ব্যস্ততার সহিত সেই ফরমান ও হালুয়া লইয়া আসিয়া সাধুবরের পদপ্রান্তে অর্পণ করিলেন এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভক্তিভবে তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইলেন।

তাপস-প্রবরের এইরূপ মাহাত্ম্য-প্রকাশক অনেক ঘটনা আছে। ফলতঃ তিনি যে এক জন অলৌকিক গুণগ্রামসম্পন্ন অদ্বিতীয় দরবেশ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আজন্ম বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সেই তত্ত্বদর্শী সুধী পুরুষ প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। পরন্তু সে কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আমরা যে কয়খানি উর্দ্দু গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার চরিতাখ্যান লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাতে এ কথার লেশমাত্র নাই। তবে কেন যে সেই সুধী দরবেশের প্রতি এই অন্যায় দুর্নাম আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তিনি বিবাহ করেন নাই এবং অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৯৪ বৎসর বয়সে সেই পুণ্যপুরুষের জীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭২৫ হিজরীর ১৭ই রবিয়ল-আখের, বুধবার। * এই দীর্ঘকাল তিনি আধ্যাত্মিক যোগ-সাধন ও বাহ্য

* কিন্তু 'তাজকেরাতল আসেকীন' ও 'সায়ের-উল-আস্‌কিয়া' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের দিন তাপসরাজ আপনার ভাণ্ডারে যে সকল খাদ্য ও অর্থাদি ছিল, সমস্তই দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্যদিগকে খেলাফতাদি দানে তুষ্ট করিয়া নমাজ পাঠান্তে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শেখ নসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ, দিল্লীর জ্যোতি (চেরাগে-দিল্লী) মওলানা ফখরউদ্দীন, খাজে করিমউদ্দীন সমরখন্দী প্রভৃতি বহু বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। গিয়াসপুরে তাঁহার পবিত্র সমাধি-সৌধ বিদ্যমান থাকিয়া তীর্থভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। সমাধি-প্রাচীর-গাত্রে একটী কবিতায় তাঁহার স্বর্গারোহণের তারিখ ও অপর বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

ইমাম জাফর সাদেক

ইমাম জাফর সাদেক প্রেরিত পুরুষের বংশধর। তিনি বিদ্যা-বিশারদ, অতুলনীয় শাস্ত্রপারদর্শী, গভীর তত্ত্বজ্ঞ ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তপোনিষ্ঠা ও খোদা-প্রীতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় বিস্ময়পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তপস্বিকুলে সেরূপ ন্যায়-নিষ্ঠাবান্ সম্মানিত সাধক অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আরববাসী আবালবৃদ্ধবনিতা মহর্ষি জাফরের প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার কাছে রাজ্যাধিপতিরও খ্যাতি-প্রতিপত্তি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য একদা তদানীন্তন খলিফা মনসুর হিংসা-প্রণোদিত হইয়া জাফরের প্রাণসংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তদনুসারে তিনি এক দিন আপন উজীরকে কহেন, "আমি জাফরের বধসাধন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমি তাহাকে অনতিবিলম্বে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" মন্ত্রী এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়-চমকিত চিত্তে কহিলেন, "কোন্ অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চাহেন? যিনি খোদা-তা'লার ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হইয়া নিয়ত নির্জ্জনবাস করিতেছেন, পৃথিবীর সুখ-

সম্ভোগ ও বিষয়-বিভবের প্রতি যাঁহার ভ্রমেও দৃক্পাত নাই, যিনি হৃদয়-মন-দেহ খোদার পথেই উৎসৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার উপর এমন কঠোরাদেশ কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?" উজীরের এই বাক্য খলিফার মর্ম্মস্পর্শ করিল না, অধিকন্তু তিনি মন্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া কহিলেন, "কোনও উপদেশ, কোনও বাধা শুনিতে চাহি না, সত্বর আমার আদেশ পালন কর।" বারংবার বারণ সত্বেও যখন খলিফা ক্ষান্ত হইলেন না, তখন উজীর ক্ষুণ্ণমনে জাফরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

এদিকে খলিফা মনসুর এক সশস্ত্র ভৃত্যকে এই আদেশ করিলেন, "তপস্বী জাফর সাদেক আমার সম্মুখে আনীত হইলে আমি তাঁহার সম্মান জন্য যখন নিজের পাগড়ী নামাইব, তখনই তুমি তলোয়ারের আঘাতে তাহার দেহ মস্তক-শূন্য করিবে!" অনন্তর উজীরের সঙ্গে মহাতপা জাফর দরবারে উপস্থিত হইলেন। দর্শনমাত্র ক্রূরমতি খলিফা দণ্ডায়মান হইয় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং যথোচিত বিনয়নম্র বচনে সম্ভাষণ করিয়া ভক্তিভরে সিংহাসনে বসাইলেন এবং আজ্ঞাবহ গোলামের ন্যায় নতমুখে সম্মুখে বসিলেন। কি ঘোর পরিবর্ত্তন! অনিষ্ট কামনায় যে হৃদয় কিছুক্ষণ অগ্রে কঠিন পাষাণবৎ হইয়াছিল, পরক্ষণেই তাহা কোমল কুসুমবৎ ভাব ধারণ করিল। নিয়োজিত জল্লাদ খলিফার

ভাব পরিবর্ত্তন—অভ্যাগতের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। খলিফা জাফরকে কহিলেন, "এ দাসের প্রতি কি আপনার কোন কার্য্যের আদেশ আছে? যদি থাকে আজ্ঞা করুন, আমি তাহা এখনই প্রতিপালন করিব।" দরবেশবর তদুত্তরে কহিলেন, "প্রার্থনা, আর কখন আমাকে এখানে আহ্বান করিবেন না, অবিলম্বে বিদায় দিন, সাধনার ক্ষতি হইতেছে।" ইহা শুনিয়া খলিফা মনসুর পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রমের সহিত ঋষিরাজকে বিদায় প্রদান করিলেন। কিন্তু কি ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত! তাপসপ্রবরের প্রস্থানের পর মুহূর্ত্তেই খলিফার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বসিবার শক্তি রহিল না। তিনি তিন দিবস অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। মতান্তরে—তিন দিবস নহে, অচৈতন্য থাকায় তিনি তিন ওয়াক্তের নমাজ পড়িতে পারেন নাই। যাহা হউক, বহু সেবা-শুশ্রূষার পর খলিফা চৈতন্য লাভ করিলেন। সুস্থ হইলে উজীর এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "যে সময়ে ইমাম সাহেব দরবার-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার পাশে পাশে একটী বিষম বৃহৎ অজগর আসিতেছে। সেই সর্প বিশাল ফণা আস্ফালন ও মুখব্যাদান করিয়া গভীর গর্জ্জনে কহিল,—যদি তুমি নিরপরাধ ইমাম জাফর সাদেককে পীড়ন কর,

নিঃসন্দেহ তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিব। ইহা শুনিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল ; আমি সর্পকে কি যে বলিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। তবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মনে আছে। তৎপর আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া অচেতন ও কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হই!" ইহা বিবৃত করিয়া খলিফা কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "উজীর! তোমার কথা না শুনিয়া এক জন পবিত্র তপস্বীর তপো-বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছি, অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে, বলা যায় না।" জ্ঞানবান্ উজীর খলিফাকে সান্ত্বনা করিলেন।

কোন সময়ে দাউদ তায়ী নামে এক দরবেশ মহর্ষি জাফরের নিকট গিয়া বিনয়-নম্র বচনে বলেন, "হে নবী-বংশধর! আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন। আমার অন্তঃকরণ পাপ-কালিমায় মসীর বর্ণ ধারণ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া হজরত জাফর সাদেক উত্তর করিলেন, "হে আবু সোলেমান! বর্ত্তমান সময়ে তুমি স্বয়ং এক জন সাধক পুরুষ, আমার উপদেশ তোমার কি উপকারে আসিবে?" দাউদ বলিলেন, "আপনি জগন্মান্য হজরত মোস্তফার বংশের উজ্জ্বল রত্ন, আপনার গুণ-গরিমা ও প্রভুত্ব সকলেরই শিরোধার্য্য। সুতরাং উপদেশ প্রদান করা আপনার পক্ষেই তো সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" তখন জাফর বলিলেন, "হে

তপস্বি! আমার ভয় হইতেছে, শেষ বিচারের দিনে পাছে আমার প্রতি প্রশ্ন হয় যে, তুমি পবিত্র 'শরিয়ৎ' অনুযায়ী যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য পালন ও সত্যের অধীনতা গ্রহণ কর নাই কেন? জানিও, উপদেশ বংশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, চরিত্র যথার্থ উপদেষ্টা।" এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া দাউদ তায়ীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি করুণকাতরে বলিয়া উঠিলেন, "হে খোদা! যিনি মহান্-চরিত্র, প্রেরিতপুরুষের বংশ-পরম্পরায় মহত্ত্ব-মহিমায় যাহার জীবন গঠিত, স্বয়ং ধর্ম্মগুরু যাঁহার প্রপিতামহের মাতামহ, সেই ব্যক্তিই যখন এরূপ সন্দিগ্ধ চিত্তে কষ্টে কালক্ষেপ করিতেছেন, তখন তুচ্ছ দাউদের গৌরব করিবার কি আছে? হায়, কোন্ গণনায় সে গণ্য হইবার যোগ্য?"

এক সময়ে মহর্ষি জাফর নির্জ্জনবাস করেন। তিনি নিয়ত নির্জ্জনে খোদা-তা'লার উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন, কদাচ গৃহের বাহিরে আসিতেন না। এইরূপে বহু দিন গত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে এক দিন দরবেশ সুফিয়ান সুরী তাঁহার নিকটে গিয়া বলেন, "হে মহাপুরুষের বংশধর! বর্ত্তমান সময়ে আপনি এক জন মহাজ্ঞানী সাধু ব্যক্তি। আপনার সহবাস সকলেরই প্রার্থনীয়। আপনার উপদেশে মনের তিমির দূর হইয়া সাধারণের

উপকার হইতে পারে। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশায় সকলে বঞ্চিত হইয়াছে। আপনার সংসর্গ যখন এত শুভজনক, তখন আপনি কি জন্য একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেছেন?" ইহার উত্তরে তপস্বী বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইব না। কেননা দুঃসময়ে একাকী বিশ্রাম করাই উত্তম, সংসার-কোলাহলে লোক আপনার বাহ্য চিন্তায় মগ্ন আছে, পরস্পর প্রণয়ালাপ করিতেছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তশ্চক্ষু সকলেরই মুদ্রিত ও অন্তঃকর্ণও বধির রহিয়াছে।" ইহাই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন; আগন্তুকও নীরবে প্রস্থান করিলেন।

একদা কোন ধনীর একটী টাকার থলি অপহৃত হয়। জাফর সেই থলিয়া অপহরণ করিয়াছেন, এই অনুমানে সে দ্রুত গিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করে। কিন্তু তাহার জানা ছিল না যে, তিনিই দরবেশ জাফর সাদেক। যাহা হউক, সহসা জাফর তাহার আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তোমার থলিয়াতে কত টাকা ছিল?" সে কহিল, "হাজার টাকা।" তখন তিনি নিজের সম্ভ্রম রক্ষার্থ তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। সে উহা পাইয়া আনন্দে গৃহে গমন করিল। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা দেখুন! তাঁহার ভক্তের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা হয়, প্রণিধান

করুন। দৈবযোগে তাহার অপহৃত মুদ্রা-থলি অন্য স্থানে পাইয়া সে বিষম ভাবনায় পড়িল;—এক জন নিরপরাধ ভদ্র লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া উৎপীড়ন করিয়াছি, বলিয়া অনুতপ্ত হইল। এই ত্রুটির প্রতীকার মানসে সে অবিলম্বে সেই সহস্র মুদ্রা লইয়া মহাত্মা জাফরের নিকট আসিয়া নত মুখে কহিল, "হজরত! আমার ভয়ানক ভ্রম হইয়াছে; না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন। যে স্থানে মুদ্রা রাখিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ ছিল না: এক্ষণে ঐ টাকা আমি পাইয়াছি; আপনি আপনার অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিন।" তখন জাফর বলিলেন, "আমি যাহা একবার দান করি, তাহা প্রতিগ্রহণ করা আমার রীতি নহে।" ইহা শুনিয়া সে নিরুত্তর হইয়া গেল। অবশেষে লোকের নিকট এই মহাপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, "কি আশ্চর্য্য! ইনি প্রেরিতপুরুষ-বংশধর মহাত্মা ইমাম জাফর সাদেক; তুমি এ সংবাদ রাখ না?" লোকমুখে ইমামের নাম শ্রবণে তাহার অন্তর চমকিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল, মর্ম্মদাহে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল; লজ্জাবনত বদনে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু মহাপ্রাণ তপস্বী তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইমাম জাফরের নিকট কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলে, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে খোদা-তা'লার রূপ দেখাইয়া দিন!" ইহাতে জাফর উত্তর করেন, "তুমি কি হজরত মুসার বিবরণ অবগত নহ? মুসা খোদার দর্শনাভিলাষী হইলে এইরূপ দৈবাদেশ হয় যে, তুমি কখনও আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে না।" প্রশ্নকারী ইহা শুনিয়া বলিল, "তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু মুসার সেই সময় আর নাই। এখন ইসলামের বিধান-মতে আমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" এই বাক্যে ধর্ম্ম-ভীরু ইমাম অসন্তুষ্ট হইয়া অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন, "ইহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া কূপে নিক্ষেপ কর।" আজ্ঞামাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইল। তাহাকে বন্ধন করিয়া কূপের পানিতে একবার নিমজ্জিত করিয়া মহর্ষির ইঙ্গিতানুসারে পুনঃ পানির উপরিভাগে উঠান হইল। এই সময়ে সে চীৎকার করিয়া কহিল, "হে প্রেরিতপুরুষ-বংশধর! আমাকে রক্ষা করুন।" জাফর পুনর্ব্বার তাহাকে নিমগ্ন করিতে বলিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত ও উত্থিত করার পর যখন সে অবশাঙ্গ ও হতাশ হইয়া আকুল কণ্ঠে নিদানের সম্বল সেই আল্লাহ্-তা'লাকে ডাকিতে লাগিল, তখন ইমাম জাফর তাহাকে সত্বর কূপ হইতে উঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরেরা অচিরে আজ্ঞা পালন করিল। অনন্তর সে সুস্থ হইয়া

মহর্ষির নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "খোদার দর্শন পাইয়াছ তো?" সে মৃদুস্বরে কহিল, "হজরত! আমি যে পর্য্যন্ত আল্লাহ্-তা'লাকে ভুলিয়া অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলাম, তদবধি আমার চক্ষে অন্ধকার ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। পরে যখন কাতর অবস্থায় সেই পরাৎপরের করুণাপ্রার্থী হইলাম, তখন দয়াময়ের প্রসাদে আমার অন্তরের পর্দ্দা দূরীভূত হইল, মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। আমি সর্ব্বব্যাপী সারাৎসারের পবিত্র সত্তা উপলব্ধি করিলাম, সেই অনাদি অনন্ত আল্লাহ্-তা'লার 'দিদার' (দর্শন) পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল —মানব-জন্ম সফল হইল। অধিক আর কি নিবেদন করিব।" ইহা শুনিয়া মহর্ষি জাফর কহিলেন, "এক্ষণে খেয়াল কর, তুমি যতক্ষণ অপরকে ডাকিতেছিলে, ততক্ষণ মিথ্যারত ও পাপী ছিলে। সুতরাং অন্ধকার ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাও নাই। কিন্তু যেই মিথ্যা পথ ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে আসিলে, অমনি তোমার অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল, খোদা-তা'লার অপরূপ জ্যোতিঃ অনুভব করিলে। তাই বলিতেছি, অদ্য তুমি যে দ্বার প্রাপ্ত হইলে, পরম যত্নের সহিত তাহার তত্ত্বাবধান করিও।"

ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম বল্‌খী

মহাত্মা ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম* ধর্ম্মগগনেব উজ্জ্বল নক্ষত্র-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সময়ে তৎসদৃশ পবিত্র দরবেশ অপব কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। তাঁহাব বাঙ্‌নিষ্ঠা, সততা ও অবিশ্রান্ত বন্দেগীব কথা শুনিলে শবীর বোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সর্ব্বোপবি তাঁহাব ত্যাগ-স্বীকার এ জগতে এক অসাধাবণ ও অতুলনীয় দৃষ্টান্তস্থল। তিনি বহু সাধু পুরুষেব দর্শন লাভ কবেন এবং অনেক সময় ধর্ম্মাত্মা হজবত আবু হানিফাব [illegible]বাসে অতিবাহিত কবিয়াছিলেন।

[illegible] কথিত আছে, এক দিন মহর্ষি ইব্‌বাহিম আদ্‌হাম [illegible] আবু হানিফার সাক্ষাৎকাব বাসনায় উপস্থিত হইলে ইমাম সাহেবের সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন নাই। হজবত আবু হানিফা সেই অন্যায় দৃশ্য দর্শনে সকলকে সম্বোধন কবিয়া বলেন, "দেখ, তোমরা ইব্‌রাহিমকে তাচ্ছিল্য করিও না। ইব্‌রাহিম আমাদিগের মধ্যেও প্রধান।" সভাসদ্‌বর্গ

---

* ইঁহার প্রকৃত নাম সুলতান ইবরাহিম আদহাম ইঁহাব পিতার নাম। কিন্তু ইনি সাধাবণ্যে ইববাহিম আদহাম নামে পবিচিত। ইঁহারা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

বলিলেন, "ইব্বাহিম প্রাধান্য প্রাপ্ত হইলেন কি প্রকাবে ? কি এমন কার্য্য করিয়াছেন যে, তজ্জন্য ইনি এমন গৌববেব পাত্র হইতে পাবেন ?" ইমাম সাহেব উত্তব দিলেন, "ইব্বাহিম নিযতই খোদা-তা'লার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, আব আমবা বিবিধ সাংসাবিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিযা কখন কখন ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। ইহাতেই ইহাব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইযাছে, জানিবে।" যখন স্বয়ং ইমাম প্রধান হজবত আবু হানিফা যাঁহাব সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ও উদাব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন সেই মহাত্মাব ধার্ম্মিকতাব বিষয়ে আর কি প্রশংসা হইতে পাবে।

ইব্বাহিম আদহাম বল্খ্ ও বোখারা [illegible] বাদশাহ্ ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজা[illegible] পবমানন্দে বাস করিত। যখন তিনি নগর[illegible] বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার আড়ম্বরের সীমা থাকিত না, তাহাব অগ্রপশ্চাৎ শস্ত্রসুসজ্জিত সৈনিক পুরুষগণ দম্ভভবে পদক্ষেপ কবিয়া গমন করিত। যে অপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহাব জীবনেব পবিবর্ত্তন ঘটে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

এক বজনীতে নৃপতি ইব্বাহিম আদ্হাম স্বীয় প্রাসাদে সুকোমল সুখ-শয্যায শয়ান ছিলেন। যখন যামিনীব দ্বিতীয যাম সমুপস্থিত, সেই সময়ে প্রাসাদেব

ছাদ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল, অনুভব করিলেন। এই গভীর নিশিতে ছাদের উপরে কে বিচরণ করিতেছে? তিনি উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "এ অসময়ে ছাদের উপরে তুমি কে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "আমার উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি।" এই কথায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ছাদের উপরে কি উষ্ট্র আসিতে পারে? এ কি অদ্ভুত কথা! বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে!" এই অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার-বাক্য পরিসমাপ্তির পরই উত্তর আসিল, "ভ্রান্ত! তুমি রত্নাভরণে ও স্বর্ণ-বিখচিত মনোরম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট বসিয়া খোদার অনুসন্ধান কর, ইহাও কি সম্ভব? তোমার কার্য্য অপেক্ষা আমার কার্য্য অধিক কি আশ্চর্য্যজনক ও অসম্ভব দেখিলে, বল দেখি?" এই তীব্র বচনে ইব্রাহিম চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার অন্তরে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি বিষণ্ণ অন্তরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে যখন তিনি দরবারে উপবিষ্ট আছেন, সভাসদ্‌বর্গ সকলেই যথাস্থানে সমাসীন, সশস্ত্র প্রহরিগণ ভীষণদর্শন যমদূতের ন্যায় দ্বার রক্ষা করিতেছে, এমনি সময়ে অকস্মাৎ এক জন প্রোজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট উন্নতকায় পুরুষ দ্রুত পাদবিক্ষেপে তথায় উপস্থিত

হইলেন। সেই বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই ভীতচকিত চিত্তে অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, হৃদয়ে বল নাই, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ! আজ যেন দরবার নির্জ্জীব প্রস্তর-মূর্ত্তিসমূহে পূর্ণ। কি অভূতপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার! সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ এরূপ দ্রুতপদে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া দরবারে প্রবিষ্ট হইলেন যে, সশস্ত্র দ্বাররক্ষকগণ বা সৈন্যসামন্তগণের মধ্যে কেহই "আপনি কে বা কি জন্য যাইতেছেন?" এই প্রশ্ন করিতেও সাহসী হইল না, সকলেই যেন কি এক যাদুবিদ্যার প্রভাবে বাক্যহীন হইয়া পড়িল। তিনি শাহী তখ্‌তের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইব্‌রাহিম কহিলেন, "আপনি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন? কোন্ বস্তু আপনার প্রয়োজন?" আগন্তুক পুরুষ উত্তর করিলেন, "আমি কিছুই চাহি না, এই পথিকাশ্রমে আসিয়াছি মাত্র।" ইব্‌রাহিম কহিলেন, "ইহা তো পথিকাশ্রম নহে, ইহা যে শাহী মহল!" তখন তিনি ইব্‌রাহিমকে কহিলেন, "এ মহল তোমার? উত্তম। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অগ্রে এ মহলে কে বাস করিত?"

ইব্‌রাহিম। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মহাশয় বাস করিতেন।

আগন্তুক। তোমার পিতার পূর্ব্বে এ প্রাসাদে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেন?

ইব্রাহিম। আমার ভক্তিভাজন পিতামহ মহাশয়।

আগন্তুক। তাঁহার পূর্ব্বে কে থাকিতেন?

ইব্রাহিম। অপর এক ব্যক্তি এ ভবনের অধিবাসী ছিলেন।

এই প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর সেই অপরিচিত পুরুষ হাস্যমুখে কহিলেন, "তবে ইহা পথিকাশ্রম নহে, বলিতেছ কি জন্য? যখন এখানে কেহই স্থায়িরূপে বাস করিতে পারে না, এক ব্যক্তি আইসে, অপর ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন ইহা পথিকাশ্রম নহে, কে বলিতে পারে?" এই কথা পরিসমাপ্তির পরক্ষণেই তিনি দ্রুতপদে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু ইব্রাহিমের অন্তর সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিল, তিনি সিংহাসন হইতে ত্বরিত উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।" উত্তর হইল, "আমি খেজের।" মহাত্মা খেজেরের নাম শ্রবণমাত্র ইব্রাহিমের অন্তরে বৈরাগ্যানল শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি বড়ই বেদনা বোধ করিলেন, বনগমনার্থ ত্বরায় অশ্ব প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন।

অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিলে বল্‌খ্‌পতি তদারোহণে সৈন্যসামন্তসহ অরণ্যের দিকে ছুটিলেন। কাননে উপস্থিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই একেশ্বর অবস্থায় গভীর বনমধ্যে "ভ্রান্ত, নিদ্রা হইতে চেতন হও!" সহসা এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। উপরি উপরি তিন বার এই দৈববাণী! চতুর্থ বার "মৃত্যু হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইবার অগ্রে জাগিয়া উঠ!" এই অভিনব শব্দ কর্ণগোচর করিলেন। এই অপূর্ব্ব ঘটনায় ইব্‌রাহিম স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও চমকিত হইলেন। চিন্তাকুলচিত্তে ভাগ্যগণনা করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী হরিণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি দ্রুত সেই হরিণের পশ্চাতে অশ্বচালনা করিলেন। কিন্তু কি অলৌকিক ব্যাপার! অশ্বারোহীর একান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া হরিণ আর অগ্রসর হইল না, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দীন নেত্রে চাহিয়া কহিল, "রাজন্! বিধাতার আজ্ঞায় আমি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনি আমার হননার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু হায়, আপনি কি এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন জন্যই জগতে আসিয়াছেন? আপনার কি অপর কোন কার্য্য নাই?" হরিণের এই উক্তি শুনিয়া ইব্‌রাহিম চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হরিণ-শিকার করিবেন কি, চিন্তার বিবিধ তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়

আলোড়িত করিয়া তুলিল। ইহা যে বিধির নির্ব্বন্ধ, তাহা তিনি বুঝিলেন। বিধাতার অনুগ্রহে ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানালোকসম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন সুখধাম স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল; নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহার অন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অশ্রু-ধারে বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া পরিচ্ছদ সিক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র অনুশোচনায় অস্থির হইয়া ম্লানমুখে গন্তব্যপথ পরিত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

ইব্‌রাহিম উদাস মনে চলিতেছেন। তাঁহার সুখ, শান্তি, উৎসাহ, আগ্রহ সকলই তিরোহিত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্দৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সহসা এক জন রাখাল তাঁহার দৃষ্টি-পথের পথিক হইল। সে কম্বলাসনে উপবিষ্ট, তাহার মস্তকে কম্বল-নির্ম্মিত মলিন টুপী; পরিধেয় বসনখানিও অতি জীর্ণ ও মলিন। বল্‌খ্‌পতি রাখালের সেই অপরিষ্কৃত টুপী ও ছিন্ন বস্ত্রের বদলে আপনার মণিমাণিক্য-বিজড়িত পাগড়ী ও বহুমূল্য পোষাক তাহাকে পরাইয়া দিয়া স্বয়ং ফকীর বেশে সজ্জিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে সুকোমল দেহ চিরদিন সুন্দর শোভা পাইত, আজ তাহা ছিন্ন কম্বলে আবৃত হইল! আজ তাঁহার নয়নে শাহী পোষাক অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। নিজের অশ্বটী পর্য্যন্ত ত্যাগ

করিলেন। আল্লাহ্‌-তা'লার কৃপায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল; তাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্গের বিত্তবরাশি প্রতিফলিত হইল। আজ তিনি অনিত্য তুচ্ছ পার্থিব সুখসম্পদের পরিবর্ত্তে অনন্ত সুখ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন;—একাকী অরণ্য-মধ্যে আপন পাপ স্মরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে এক দিন তিনি একটী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর উপরে সেতু ছিল, এক অন্ধ সেই সেতু পার হইতে গিয়া জলে পড়িবার উপক্রম হইলে ইব্‌রাহিম কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা কবিলেন, "আল্লাহ্‌-তা'লা! হে দয়াময় বিধাতা! তোমার এই নিঃসহায় অন্ধ সন্তানকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা কর—অপমৃত্যু হইতে বাঁচাও।" ভক্তের আকুল আহ্বানে দয়াময়ের অন্তর দয়ার্দ্র হইল। অন্ধ শূন্যপথে পদক্ষেপ করিতেই মহিমার্ণবের মহিমায় অচল অটল অবস্থায় রহিল—পতিত হইল না। তখন ইব্‌রাহিম ত্বরিতপদে গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। লোকে এই অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

অনন্তর তিনি নেশাপুরে * গিয়া এক পর্ব্বত-গহ্বরে আপনার বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন। এখানে

* নেশাপুর—আফগানিস্থানের একটী নগর।

তিনি নয় বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার কঠোর ধ্যান-ধারণার কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সেই নির্জ্জন প্রদেশের অন্ধকারময় বিজন গিরি-কন্দরে শীতের প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, তাহাকে শীতের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজন্ম সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত বাদশাহ্ ইব্রাহিম এই ভয়াবহ স্থানে দারুণ শীতে অসাড় জড়পিণ্ডের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবিশ্রান্ত যোগ-সাধনে বিভোর থাকিতেন! সপ্তাহের মধ্যে প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি গুহার বাহির হইয়া জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। পরদিবস শুক্রবার প্রভাতে সেই কাষ্ঠ নেশাপুরের বাজারে গিয়া বিক্রয় করিয়া মস্‌জিদে জুম্মার নমাজ পড়িতেন। পরে কাষ্ঠবিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইতেন, তাহাতে রুটী কিনিয়া আনিয়া অর্দ্ধেক রুটী দীন-দুঃখীদিগকে দিয়া বাকী রুটী নিজের সাত দিনের ভোজনার্থ লইয়া প্রস্থান করিতেন। এই অবস্থায় মহর্ষি দীর্ঘ কাল যাপন করিয়াছিলেন।

এক রজনীতে দারুণ শীতে গিরি-গর্ভ বরফাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তপোধন ইব্রাহিমের দেহ শীতে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, জীবন সংশয়প্রায়, আর তিষ্ঠিতে পারেন না। বরফস্তূপের নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এ সময় যদি একটু আগুন

পাইতাম, তাহা হইলে আমার ক্লেশের অবসান হইতে পারিত।" কি আশ্চর্য্য! যেই কামনা সেই কার্য্য, যেই প্রবৃত্তি সেই নিবৃত্তি, যেই সঙ্কল্প পর মুহূর্ত্তেই তাহার সিদ্ধি। মহর্ষির চিন্তার গতি মনোমধ্যে বিলীন হইতে না হইতে করুণাময় আল্লাহ্‌-তা'লার মহিমায় ইব্‌রাহিম পৃষ্ঠদেশে উষ্ণতা অনুভব করিলেন; তদ্দ্বারা শীঘ্রই শীতের প্রভাব দূরীভূত হইল; তিনি প্রাণে আরাম পাইয়া নিদ্রাগত হইলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড ভীষণ ভুজঙ্গ পশ্চাৎভাগে পতিত রহিয়াছে। বুঝিলেন, এই বিষধরের দেহের উষ্ণতা হইতেই তাঁহার শরীরে তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার ভয়ানক ভয় হইল। গদগদ স্বরে কহিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ও রক্ষক! প্রথমে যাহাকে দয়ার মূর্ত্তিতে প্রেরণ করিয়াছিলে, শেষে সেই আবার ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইল। আমি আর কি করিব? তুমি কৃপা না করিলে ইহাকে দূরীভূত করা আমার সাধ্য নহে।" এই প্রার্থনায় সর্পরাজ হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল।

কথিত আছে, তপস্বিপ্রবর চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত বহু নগর ও পর্ব্বত-প্রান্তরাদি পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে মক্কা শরীফে আগমন করেন। মক্কাবাসী সাধুবৃন্দ তাঁহার সমাগম-সংবাদ পাইয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ নগর বহির্ভাগে আনিতে যান। কিন্তু

ইব্‌রাহিম সেই সম্মান হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিবার বাসনায় আত্মগোপন করিলেন। পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই ভয়ে তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় যাত্রিদলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এদিকে মক্কাবাসী সাধুগণের জনৈক পরিচারক মহর্ষির অন্বেষণ করিতে যায়। সে ইব্‌রাহিমেরই নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, “হজরত ইব্‌রাহিম কোথায়, বলিতে পার কি? মক্কা নগরীর প্রধানবর্গ তাঁহার সাক্ষাৎকার বাসনায় এখানে আসিয়াছেন।” ইব্‌রাহিম কহিলেন, “সেই পাপীর নিকটে তাঁহাদের কি প্রয়োজন আছে?” এই অবজ্ঞার কথা শুনিয়া পরিচারক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গর্দ্দানে ও মুখে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে কহিল, “পামর! তুই খোদার দরবেশের প্রতি এমন অসম্মানের কথা বলিস! তোর মত পাপী ও নরাধম কেহ নাই।” ইব্‌রাহিম আঘাত পাইয়াও চঞ্চল হইলেন না, মৃদু স্বরে কহিলেন, “আমিও তো এই কথা বলিয়াছি। তোমরা তাহা না বুঝিয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলে!” পরে পরিচারক ও অপর সকলে অন্য দিকে চলিয়া গেলে ইব্‌রাহিম আপন নফ্‌স্‌কে (আত্মাকে) কহিলেন, “কেমন, শাস্তির আস্বাদ পাইলে তো?” ইহাই বলিয়া তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পরিশেষে যখন সত্য প্রকাশিত হইল—সকলে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল,

তখন সেই পরিচারক কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পদানত হইয়া অপরাধের মার্জ্জনা চাহিল। এই সময় হইতে মহর্ষি মক্কাবাস করেন। তথায় বহু লোক তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মক্কা অবস্থান-কালে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার জীবিকা উপার্জ্জিত হইত—কখন জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিয়া, কখন বা খরমুজা কিনিয়া বিক্রয় করিতেন।

যখন বল্‌খ্‌রাজ ফকীরবেশে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র বর্ত্তমান ছিল। সেই পুত্র বয়স্থ ও জ্ঞানবান্ হইয়া মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বল্‌খেশ্বরীর নির্ব্বাপিত শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি সজলনেত্রে পুত্রের নিকট স্বামীর সংসারাশ্রম পরিত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "সংবাদ পাইয়াছি, এখন তিনি মক্কায় আছেন। সেখানে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া নিজের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন।" শাহ্‌জাদা জননীর মুখে এই দুঃখের কথা শুনিয়া বড়ই সন্তপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, "মা! আমি পবিত্র মক্কাতীর্থ দর্শনে গমন করিব। তথায় হজ-ব্রত পালন করিব এবং আমার পিতার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আপনি নগরে ঘোষণা করিয়া দিন, যে ব্যক্তি পবিত্র হজ-ব্রত

পালনে ইচ্ছুক, আমার সঙ্গে গমন করিলে আমি যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিব।” পুত্রের সদিচ্ছায় বেগমের হুকুমে নগরে এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হইল। বিশ্বস্ত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, এই সমস্ত হজযাত্রীর সংখ্যা চারি সহস্র হইয়াছিল। শাহ্জাদা এই সমস্ত লোক সঙ্গে লইয়া মাতার সহিত পিতার দর্শন-লাভ বাসনায় মক্কা যাত্রা করিলেন।

শাহ্‌জাদা মক্কায় উপনীত হইয়া পবিত্র কা'বা মস্‌জিদের নিকটে কয়েকজন দরবেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি মহাত্মা ইব্‌রাহিম আদ্‌হামের সংবাদ রাখেন? তিনি আছেন কোথায়? যদি জানা থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিলে পরমোপকৃত হইব।” এই প্রশ্নে দরবেশরা কহিলেন, “আমরা তাঁহার সহিত [illegible] পরিচিত আছি। তিনি আমাদের মোরশেদ, এখন তিনি কাঠ কাটিতে জঙ্গলে গিয়াছেন। সেই কাষ্ঠবিক্রয়ের অর্থে তাঁহার নিজের এবং আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন।” পিতার এই ভীষণ ক্লেশের কথা শুনিয়া শাহ্‌জাদা দারুণ বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি কোনরূপে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে মাতৃ-সকাশে গমন করিলেন।

হজরত ইব্‌রাহিম আদহাম কাষ্ঠ-বিক্রীত অর্থে রুটী

ক্রয় করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শিষ্য ও সমাগত বন্ধুদিগকে সেই রুটী বিভাগ করিয়া দিয়া আপন অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক নমাজে নিমগ্ন হইলেন।

অতঃপর মহর্ষি নিজ কুটীরে সমাসীন, শিষ্যবর্গ গুরূপদেশ শ্রবণে নিরত; এমন সময়ে বল্‌খ্‌-বেগম পুত্রসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামীকে দেখিবামাত্র চিনিয়া আপন পুত্রকে দুঃখকম্পিত স্বরে কহিলেন, "বৎস, ঐ দেখ তোমার জন্মদাতা পিতা।" এই কথায় সেই তাপস-কুটীরে সহসা ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, সকলেরই চক্ষে অশ্রু ঝরিল। হজরত ইব্‌রাহিমেরও স্নেহ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রকে আগ্রহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অতঃপর পিতাপুত্রে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হওয়ার পর পিতা মনে করিলেন, "এ কি! যে বিষম মায়া-জাল ছিন্ন করিয়াছি, তাহাতেই আবার বিজড়িত!" ইহা ভাবিয়া তিনি মায়াপাশ পুনঃ ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়, সকলই বৃথা হইল। পুত্রের কাতরতায়, প্রেয়সীর করুণ বচনে সে কার্য্য সাধন করিতে পারিলেন না। তখন সংসারবিরাগী তপস্বী মহাবিপদাপন্ন হইলেন। কি করিবেন? অবশেষে উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া যেই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,

অমনি পিতার ক্রোড়ের উপরে থাকিয়া বিধাতার ইচ্ছায় পুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।

এই দারুণ দুর্ঘটনায় মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। হায় হায় আর্ত্তনাদে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। বেগম চক্ষের পুতলী জীবনের সম্বল পুত্ররত্ন হারাইয়া উন্মাদিনী হইলেন। শিষ্যমণ্ডলী এই শোকাবহ ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, "হজরত! এ কি করিলেন? নিরপরাধে এই বালকের—স্বীয় পুত্রের প্রাণনাশ করিলেন? হায়, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কি আছে?" ইব্রাহিম কহিলেন, "প্রিয়গণ! জানিও, ইহা সেই বিশ্ব-বিধাতাব খেলা। আমি কি করিব? যখন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, তখন এইরূপ দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল,—ইব্রাহিম! তুমি না আমার বন্ধুত্বের—আমার প্রণয়ের দাবী রাখ? জান, আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমার কেহ অংশী নাই। তবে তুমি সে প্রেমের—সে বন্ধুত্বের অংশ অপরকে অর্পণ করিতেছ কেন? তুমিই তো শিষ্যবর্গকে স্ত্রী-পুত্রাদির মায়ায় মুগ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া থাক। এক্ষণে নিজেই তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছ?" ইহা শুনিয়া আমি বিষম লজ্জিত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—"হে করুণাময় খোদা-তা'লা! পুত্রস্নেহে যদি তোমার পবিত্র প্রণয়-পথের বাধা জন্মায়, তবে আর আমার এ

জীবনের প্রয়োজন কি? হয় আমার, না হয় আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া এ অপরাধের উপসংহার কর। এই প্রার্থনায় মঙ্গলময়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইয়াছে, আমি কি করিব? আমার কি অপরাধ আছে?" ইহা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। পাঠক! অকৃত্রিম ও অপার্থিব ঐশী প্রেমিকতার কি অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় জ্বলন্ত প্রভাব, একবার প্রণিধান কর।

এক সময়ে তাপস ইব্‌রাহিম এক বাগানে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইত, তদ্দ্বারা তিনি নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিন উদ্যানস্বামী উদ্যানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুমিষ্ট দাড়িম্ব আনিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। তাহাতে ইব্‌রাহিম অবিলম্বে কতকগুলি দাড়িম্ব আনিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিলেন। উদ্যানপতি সেই দাড়িম্ব ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া বদন বিকৃত করিয়া ক্ষুণ্ণমনে কহিলেন, "এ কি, এত দিন পর্য্যন্ত এই বাগানে রহিয়াছ, কোন্ বৃক্ষের ফল মিষ্ট এবং কোন্ বৃক্ষের ফল অম্ল, তাহার সংবাদ রাখ না?" ইব্‌রাহিম কহিলেন, "বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ জন্যই আমাকে রাখিয়াছেন, কিন্তু ফল ভক্ষণ করিতে তো অনুমতি করেন নাই! সুতরাং ফলের মিষ্টতা বা অম্লতার বিষয় আমি কেমন করিয়া

জানিব ?” এই উত্তর শুনিয়া উদ্যানস্বামী সবিস্ময়ে কহিলেন, “আপনি কি মহাত্মা ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম ? তিনি ব্যতীত এরূপ কার্য্য—এরূপ অপূর্ব্ব লোভ-সংবরণ আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে ?” মহর্ষি ইব্‌রাহিম এই আত্ম-প্রশংসা শ্রবণমাত্র সেই বাগান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

মহর্ষির বস্‌রা গমনকালে পথিমধ্যে এক যোদ্ধৃ-পুরুষ “লোকালয় কোন্ দিকে আছে ?” জিজ্ঞাসা করায় তিনি কবরস্থান দেখাইয়া দেন। তাহাতে সৈনিক ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া “কি ? আমার সহিত বিদ্রূপ !” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ভয়ানক প্রহার করে এবং তাঁহাকে বন্ধন করিয়া নগরাভিমুখে লইয়া যায়। নগরবাসিগণ মহর্ষির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠে ; চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হয়। সকলে ক্রোধভরে সেই হীনবুদ্ধি সৈনিককে বিস্তর তিরস্কার করে। তখন সে ঋষিরাজের নাম শুনিয়া ভীতচিত্তে তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন মহর্ষি বলেন, “ভয় নাই, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক ! তুমি যে আমাকে প্রহার করিয়াছ, তাহা প্রহার নহে, আমি তাহাতে সুখানুভব করিয়াছি। তোমার অমঙ্গল হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।” এই বাক্যে

সৈনিক আশ্বস্ত হইয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, "হজরত! আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরে নগরের পরিবর্তে গোরস্থান দেখাইলেন কি জন্য?" তিনি কহিলেন, "দেখ, ক্রমাগত গোরস্থানেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং নগরের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটিতেছে। মানুষ মরিয়া গোরস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! যখন গোরস্থানের ক্রমেই উন্নতি,—ক্রমেই লোক তথায় সমবেত হইতেছে, তখন গোরস্থানকে লোকালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক নহে।"

তাপসপ্রবর এক দিন নদীতীরে বসিয়া আপনার ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেছিলেন। সহসা হস্তস্খলিত হইয়া তাঁহার সূচনী জলমধ্যে পড়িয়া যায়। তিনি সূচের জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গিয়া সদুঃখে কহিল, "হায় কি অনুতাপ! বল্‌খের তখ্‌ত্‌ ও তাজ ত্যাগ করিয়া কোন্‌ ফললাভ করিয়াছ? শাহী খানা, শাহী মহল, শাহী পোষাক পরিত্যাগ করিয়া এ কষ্ট বরণ কেন?" ইব্‌রাহিম এই বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "আমার সূচ কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিলেন। কি অপূর্ব্ব তপোবল! অমনি আল্লাহ্‌-তা'লার মহিমায় সহস্র সহস্র মৎস্য সূচ মুখে করিয়া জলোপরি ভাসিয়া উঠিল। তখন ইব্‌রাহিম কহিলেন, "আমি নিজের সূচ চাহি; অসংখ্য সূচে আমার কি প্রয়োজন?"

ইহাতে একটী মৎস্য মহর্ষির সূচটী মুখে করিয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ইব্‌রাহিম আপনার সূচ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে কহিলেন, "বল্‌খের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার এই এক নিদর্শন, তুমি প্রণিধান করিয়া বুঝ।"

এক ব্যক্তি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি খোদা-তা'লার নিকটে দোওয়া প্রার্থনা করি, কিন্তু তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করেন না। ইহার কারণ কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া আমার ভ্রম ভঞ্জন করুন।" তপস্বিপ্রবর কহিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কিরূপে? খোদা-তা'লার উপর তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু যথানিয়মে তাঁহার সাধনা কর না। তাঁহার প্রেরিত শেষ নবীকে বিশেষরূপে চিনিয়াও তাঁহার বিধানমতে চল না। কোর্আন শরীফ পাঠ কর বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর না। প্রতিদিন আল্লার অনুগ্রহ ভোগ করিতেছ, কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাও না; আজ্ঞাধীন ব্যক্তিবর্গের জন্য বেহেশ্‌তের সৃষ্টি, ইহা জানিয়াও তৎলাভে যত্নবান্ হও না। শয়তানকে ভীষণ শত্রু জানিয়াও তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে জানিতেছ, তথাপি তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেছ না। মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনগণকে নিয়ত কবরস্থ করিতেছ,

তথাপি তোমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় না। আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টি কর না, কিন্তু পরের ছিদ্র অন্বেষণে সদাই মত্ত। বল দেখি, যে ব্যক্তির আচরণ এইরূপ, তাহার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইতে পারে?”

মহর্ষির এইরূপ শত শত উপদেশ ও জীবনের শত শত ঘটনা বিদ্যমান্ রহিয়াছে। তৎসমুদয় পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় প্রফুল্ল ও মন অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া উঠে। শেষ জীবনে তিনি এক স্থানে না থাকিয়া স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা কোন্ স্থানে যে দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছিল, কোথায় যে তাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই। তবে একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি জীবনের শেষভাগে এশিয়া মাইনরে অবস্থিতি করেন এবং লুত পয়গম্বরের সমাধির নিকটস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় প্রাণত্যাগ করেন।

তপস্বী ফজিল আয়াজ

তপস্বী ফজিল আয়াজ বোগদাদের ভুবনবিখ্যাত খলিফা মহামতি হারুণ-অর-রশীদের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। অলৌকিক তপশ্চর্য্যা ও অপূর্ব্ব তত্ত্বোপদেশ-প্রদান-হেতু তিনি জন-সমাজে প্রভূত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং খলিফা ফজিল আয়াজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা দর্শনে এবং মধুর সদুপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইয়াছিলেন।

তপস্বী ফজিল আয়াজের প্রথম জীবন পুণ্য-পথগত ছিল না। তিনি পরস্বাপহারী ভীষণ দস্যু নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, দস্যুবৃত্তির দ্বারা তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। পরন্তু সেই দস্যুবৃত্তির মধ্যেও তাঁহার মহত্ত্ব, উদারতা, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বিশদভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় শক্তিসাধ্য কার্য্যেই অগ্রসর হইতেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, মহিলাকুলের উপর উৎপীড়ন বা অপর কোন নিন্দনীয় কার্য্য তিনি কদাচ করিতেন না। যে সকল পথিকের নিকটে অল্প অথবা প্রয়োজনীয় ব্যয়যোগ্য অর্থাদি থাকিত, তিনি তাহা কখন গ্রহণ করিতেন না। কথিত আছে, ফজিল কোন একটী রমণীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত

ছিলেন। দস্যুতা-লব্ধ অর্থাদি তিনি সেই রমণীর নিকট প্রেরণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত দেখা করিতেন।

ফজিল আয়াজ স্বয়ং প্রায় দস্যুতা করিতেন না। তিনি এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যে তাম্বু স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর বেশে অবস্থিতি করিতেন। হস্তে জপমালা, মস্তকে টুপি ও পরিধানে দরবেশের পরিচ্ছদ তিনি নিরন্তর ধারণ করিতেন। আবার দৈনিক নমাজেরও ব্যতিক্রম ঘটিত না। আপনার অধীন অনুচরবর্গকেও এই নিয়ম পালনে বাধ্য করিয়াছিলেন। কাহারও সে বিষয়ে শৈথিল্য দেখিলে ফজিল তাহাকে স্বদল হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

ফজিলের অনুচরগণ সকলেই দস্যু ছিল। তাহারা সেই প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া পথিক ও বণিক-দলের ধন লুণ্ঠন করিয়া ফজিলের নিকট আনয়ন করিত। দস্যুনেতা ফজিল লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে আপনার অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন।

এক দিন এক দল সওদাগর ফজিলের অধিকৃত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দস্যুর কবলমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, অতঃপর ইহা জানিতে পারিয়া চিন্তাকুল ও বিহ্বল হইলেন। এক জন চতুর সওদাগর আপনার ধন-রত্ন জঙ্গলের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া

রাখিবার মানসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন। হঠাৎ ফজিলের তাম্বু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাম্বুর কাছে গেলেন,—দেখিলেন, এক জন দরবেশ তস্‌বীহ্‌-হস্তে বসিয়া আছেন। সওদাগর খুব আশ্বস্ত হইলেন, ভাবিলেন, ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, ইঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিলে অর্থের অপচয় হইবে না। এই চিন্তা করিয়া ফজিলের সম্মুখে গিয়া আপনার বিপদের কথা জানাইয়া ধন-রত্ন রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। ফজিল সম্মত হইলেন। তখন বণিক তাম্বুর মধ্যে তাঁহার যাবতীয় অর্থ রাখিয়া সহগামী সওদাগরদের নিকটে গমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, দস্যুরা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া লুণ্ঠন, করিয়াছে; দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। কেহ পায়ে, কেহ হস্তে, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে আঘাত পাইয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। চতুর সওদাগর এই বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন এবং তাঁহার ধন-রত্নও রক্ষিত হইয়াছে, ভাবিয়া খোদা-তা'লাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর দস্যুরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া সওদাগর নিজের গচ্ছিত অর্থাদি আনিবার জন্য ত্বরিতপদে তাম্বুর দিকে গমন করিলেন। তিনি সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া

গেল! তিনি দেখিলেন, তাঁহাদেরই দ্রব্যজাত এবং ধন-রত্ন দস্যুরা তাম্বুর মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছে এবং স্বয়ং সেই দরবেশ বণ্টন করিয়া দিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সুফী-সাধু-দরবেশ কি কখনও এইরূপ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? কখনই নহে। সওদাগর তখন বুঝিলেন, এই ব্যক্তি দরবেশ নহে,—এই দস্যুদলের নেতা। লোকের বিভ্রম ঘটাইবার জন্য কপট সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছে। তখন দারুণ দুঃখে সওদাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"হায়—হায়, আমি সাধ করিয়া ডাকাতের হাতে ধন-দৌলত তুলিয়া দিলাম! সাধুভ্রমে পাপীর সেবা করিলাম। অমৃতজ্ঞানে বিষ পান করিলাম!" এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, ইত্যবসরে হঠাৎ ফজিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে ডাকিলেন। ফজিলের আহ্বানে সওদাগর আপনাকে আরও বিপন্ন বোধ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শুকাইয়া গেল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তিনি কম্পিত কলেবরে তথায় উপস্থিত হইলেন। ফজিল তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ?" সওদাগর সাহসে নির্ভর করিয়া উত্তর করিলেন, "আমার টাকা লইবার জন্য আসিয়াছি।" ফজিল কহিলেন, "যথাস্থানে আছে, গ্রহণ কর; কোন চিন্তা নাই।" এই অভয়বাণী শুনিয়া

সওদাগর আপনার রক্ষিত অর্থ লইয়া আনন্দে আপনার সঙ্গীদের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ফজিলের অনুচরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কহিল, "আজিকার লুট-তরাজে বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই; ইহা দেখিয়াও তুমি হস্তগত ধন কি বলিয়া ছাড়িয়া দিলে?" ফজিল কহিলেন, "দেখ, এই সওদাগর আমাকে ধার্ম্মিক জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সুতরাং আমিও তাঁহার সেই বিশ্বাস অটল ও অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য খোদার উপর দৃষ্টি রাখিয়া এই কার্য্য করিলাম।" ইহা শুনিয়া তাহারা নীরব হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

অপর দিকে এক দিন নীচাশয় দস্যুরা এক দল সওদাগরের উপর পড়িয়া তাঁহাদের যাবতীয় ধন-সামগ্রী লুট করিয়া লইল। এই সওদাগর-দলের এক ব্যক্তি এক জন দস্যুর নিকটে আসিয়া কহেন, "তোমাদের মধ্যে প্রধান কে?" দস্যুরা কহিল, "তিনি নদীর ধারে নমাজ পড়িতেছেন।" সওদাগর বলিলেন, "নমাজের সময় এখনও তো উপস্থিত হয় নাই। তবে এ কি প্রকার নমাজ?" তাহারা বলিল, "তিনি নফল নামাজ পড়েন।" সওদাগর কহিলেন, "আচ্ছা, তিনি আহার করেন কখন?" তাহারা কহিল, "তিনি রোজা-ব্রত

পালন করেন, দিবসে আহার করেন না।" সওদাগর ইহা শুনিয়া কহিলেন, "এখন তো রোজা পালন করিবার সময় নয়? এ তো রমজান মাস নহে।" "তিনি নফল রোজা পালন করেন" দস্যুদের মুখে এই উত্তর শুনিয়া সওদাগর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ফজিলের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিক ফজিল নমাজে দণ্ডায়মান আছেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সওদাগর অপলক নয়নে চাহিয়া রহিলেন। নমাজ সাঙ্গ হইলে তিনি ফজিলকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "নমাজ ও রোজার মধ্যে দস্যুবৃত্তি! ইহাও কি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গ?" ফজিল ইহা শুনিয়া কহিলেন, "আপনি কি পবিত্র কোর্‌আন শরীফ পাঠ করিয়াছেন?" সওদাগর কহিলেন, "হাঁ, দয়াময়ের অনুগ্রহে আমি তাহা অবগত আছি।" তখন ফজিল ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তবে কি আপনি এই 'আয়েত' অবগত নহেন,— (লোকে) আপনার পাপকে স্বীকার করিয়াছে এবং সৎকার্য্যকেও তাহার সামিল করিয়া লইয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সওদাগর অবাক্ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান

ফজিলের দস্যুতা এইরূপে চলিয়া আসিতেছিল। ফজিলের ও তৎসহচরগণের ভয়ে লোকে সেই প্রান্তর দিয়া গমনাগমন ত্যাগ করিয়াছিল। "দস্যু ফজিল"

বলিলেই তাহাদের প্রাণ উড়িয়া যাইত। কিন্তু খোদা-তা'লার কি অপার মহিমা! যে নাম লোকের অন্তরে ভয়, অশ্রদ্ধা ও অতীব ঘৃণা জন্মাইত, যে নাম শুনিয়া লোকে আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিত, সেই নামই আবার জগতের ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইতে চলিল। সাধারণে সেই নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া যে নির্ম্মল আনন্দানুভব করিবে, দৈবানুগ্রহে তাহার শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। প্রিয় পাঠক! বিস্মিত হইবেন না, যিনি নিজ মহিমায় অন্ধকারময় খনির গর্ভে মণি, গভীর জলধি-উদরে শুক্তি-মধ্যে মূল্যবান্ মুক্তা এবং ইঙ্গিতে আরও কত বিস্ময়কর ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতে পারেন, সেই খোদা-তা'লার অসীম কৃপায় পাপীর মলিন হৃদয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে প্রোজ্জ্বল ও পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে!

একদা নিশীথ-সময়ে এক দল সওদাগর আপনাদের মূল্যবান্ পণ্যসহ ঘটনাক্রমে সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফজিল যেস্থানে থাকিতেন, তাঁহারা নিরাপদে যামিনী যাপনার্থ ঠিক তাহারই সম্মুখে আসিয়া তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন। জানিতে পারেন নাই যে, দস্যুর গ্রাস-মধ্যে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বণিকগণ নির্ভয়! কেহ নিদ্রিত,

কেহ জাগরিত, কেহ বা পাহারা দিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রান্তর নীরব—নিস্তব্ধ! এই সময়ে এক সওদাগর কোর্‌আন শরীফ পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠের কোমল ধ্বনি যামিনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। পাঠকের উচ্চারণ যেমন বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত, কণ্ঠস্বরও তেমনি সুললিত ও শ্রবণরঞ্জন! ফজিলের অন্তর বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে ধাবিত হইল, অমনি তাঁহার কঠিন হৃদয় দমিত হইয়া কোমল ভাব ধারণ করিল। তিনি মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় কাণ পাতিয়া সেই কোরআন-পাঠ শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে "হে নিদ্রিত! আল্লার ভয়ে জাগরিত হইবার সময় এখনও কি তোমার উপস্থিত হয় নাই?" এই ভাবের একটী 'আয়েত' (শ্লোক) শ্রবণ মাত্র তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার চেতনার সঞ্চার হওয়ায় বুঝিলেন, এই দীর্ঘকাল কি ভয়ানক কুকার্য্যেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। দারুণ অনুশোচনায় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সহচর দস্যুদিগকে ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে গভীর অরণ্য-মধ্যে দৌড়িতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, আর এক দল সওদাগর বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে। তাহারা পরস্পর বলিতেছে, "দস্যু ফজিলের আড্ডা সম্মুখে, তাহার

অত্যাচারে এই পথ অতি দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং এই পথে আমাদের কোনক্রমেই যাওয়া উচিত নহে।” এই কথা শুনিয়া ফজিল আরও সন্তপ্ত হইলেন এবং দুঃখকম্পিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “ভাই সকল! আর ভয় নাই, আজ আমি তোমাদিগকে সুসমাচার দিতেছি, সেই দুরাচার ফজিল নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে এবং সে আল্লার নামে শপথ করিয়া পাপ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমরা যেমন তাহার নিকট হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে, সেও তেমনি আজ তোমাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইতেছে। সন্দেহ করিও না ; তোমরা নির্ভয়ে গমন কর।” ইহা বলিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে আবার দৌড়িতে লাগিলেন।

এইরূপ অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পান, তাহারই নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনন্তর এক দিন তিনি এক ব্যক্তিকে করুণকণ্ঠে কহিলেন, “ভাই! আমাকে বন্দী করিবার জন্য বাদশার হুকুম আছে। আমি তাঁহার শাস্তির যোগ্য পাত্র ; অতএব তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহার শাস্তি গ্রহণ করিব।” এইরূপ বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সেই ব্যক্তি ফজিলকে বাদশার দরবারে হাজির করিল।

বিচক্ষণ বাদ্‌শাহ্‌ ফজিলের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব ভাব আর নাই; তাঁহার অন্তর বিশোধিত হইয়াছে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন বাদশাহ্‌ হাস্যমুখে ফজিলকে সম্মানের সহিত তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। বাদশাহী তত্ত্বাবধানে ফজিল স্বভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অঙ্গনে পদার্পণ করিতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ কহিল, "আজ তোমাকে এমন ম্রিয়মাণ দেখিতেছি কেন? তোমার বেশ-ভূষার শৃঙ্খলা নাই, কণ্ঠস্বর ভগ্ন এবং চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিতেছে। তবে কি তুমি গুরুতর আঘাত পাইয়া কাতর হইয়াছ?" ফজিল কাতরভাবে কহিলেন, "হাঁ! আজ ভয়ানক আঘাত পাইয়াছি?" তাহারা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কোথায় লাগিয়াছে!" "প্রাণে লাগিয়াছে, সে আঘাতের আর ঔষধ নাই!" এই কথা বলিয়া গৃহমধ্যে গমন করিয়া বিবিকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে মক্কা শরীফ যাইব।" তখন সেই পুণ্যময়ী মহিলা কহিলেন, "আমি তোমা হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারিব না। তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সুখে-দুঃখে সেই স্থানে তোমার নিকট থাকিয়া, তোমার পদ-সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে চাই। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।" এই সন্তোষজনক উত্তর

পাইয়া তিনি বিবিকে সঙ্গে লইয়া মক্কাযাত্রা করিলেন ; খোদা-তা'লা তাঁহাকে সৎপথের পথিক করিলেন।

পুণ্যক্ষেত্র মক্কায় আসিয়া ফজিল আয়াজের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। বণিক্‌মুখে কোর্‌আন শরীফের পবিত্র উক্তি শ্রবণে তাঁহার অন্তরে যে বৈরাগ্যানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা সুফল প্রসব করিল। তিনি মক্কাধামে বহু সুফী-সাধু-সহবাসে, বিশেষতঃ ইমাম-শ্রেষ্ঠ হজরত আবু হানিফার নিকট দীর্ঘকাল থাকিয়া প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শী হইলেন। তিনি নিয়ত নির্জ্জনে খোদার চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন এবং পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া বিরস-বদনে আল্লাহ্-তা'লার দরবারে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা ও অবিশ্রান্ত ধ্যান-ধারণা দেখিয়া মক্কাবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করিতে লাগিলেন। অচির-কাল মধ্যেই তিনি 'দরবেশ ফজিল আয়াজ' এই গৌরবাত্মক নামে সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিলেন এবং অবশেষে উপদেশকের পদে উপবিষ্ট হইলেন। নশ্বর মানবজীবনে এতদপেক্ষা সুখ ও সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে ? এইরূপে এক জন পাপরত পথভ্রান্ত পুরুষ আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্ম-জীবন প্রাপ্ত হইলেন—জগতের নিকট সাধু নামে পরিচিত হইলেন। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন !

কিছু দিন পরে ফজিলের পূর্ব্ব সহচরগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আপনার বাটীতে স্থান দিলেন না, আপনার বাস-ভবনের ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! করুণাময় খোদাতা'লা তোমাদিগকে সুমতি দান করুন। আমার দিকে মুখ ফিরাইলে কি হইবে? সত্যের দিকে মুখ ফিরাও, উভয়কালের বাসনা পূর্ণ হইবে, মনোমত ধন প্রাপ্ত হইবে।" আগন্তুকগণ ইহা শুনিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল এবং হতাশ-হৃদয়ে অনুতাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সুলতান হারুণ-অর-রশীদের প্রতি ফজিলের উপদেশ

একদা রাত্রিকালে মহামান্য সুলতান হারুণ-অর-রশীদ জনৈক প্রিয় পারিষদকে কহিলেন, "অদ্য আমাকে কোনও দরবেশের সংসর্গে লইয়া চল। জঞ্জালময় রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া আজ আমার অন্তর বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে; কিছুক্ষণ সাধুলোকের সংসর্গে থাকিয়া শান্তিলাভ করিব, এই আমার বাসনা।" ইহা শুনিয়া পারিষদ বাদশাকে লইয়া তাপস সুফিয়ানের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার গৃহ-দ্বারে করাঘাত করিতেই তিনি কহিলেন, "কে তুমি দ্বারে আঘাত করিতেছ?" পারিষদ

কহিলেন, "খলিফা হারুণ-অর-রশীদ উপস্থিত।" তখন সুফিয়ান ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ভাই! এ সংবাদ তুমি অগ্রে আমাকে কহিলে না কেন? তাহা হইলে আমি নিজেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতাম।" বিচক্ষণ নরপতি হারুণ-অর-রশীদ তপস্বীর মুখে এই দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া পারিষদকে ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি যে ব্যক্তির সংসর্গ ইচ্ছা করিতেছি, ইনি তিনি নহেন।" সুফিয়ান ইহা শুনিয়া কহিলেন, "আপনি যেরূপ লোকের দর্শনাভিলাষী, এখন আমি বুঝিলাম, তিনি দরবেশ ফজিল আয়াজ ভিন্ন আর কেহই নহেন।"

অনন্তর বাদশাহ্ পারিষদসহ ফজিল আয়াজের ভবনে উপনীত হইলেন। এই সময়ে তিনি গৃহমধ্যে "অসৎমতিরা কি অবধারণ করিয়া লইয়াছে যে, তাহাদিগকে ধর্ম্মাত্মগণের সহ গ্রহণ করিব?" পবিত্র কোর্-আনের এইভাবের একটী আয়েত পাঠ করিতেছিলেন। খলিফা হারুণ-অর-রশীদ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বাসনা সফল হইল; যদি কোন উপদেশ শ্রবণের প্রয়োজন হয়, তবে ইহাই যথেষ্ট।" পরে দ্বারে করাঘাত করিলে মহর্ষি বলিলেন, "কে তুমি?" পারিষদ উত্তর করিলেন, "খলিফা হারুণ-অর-রশীদ।" দরবেশ কহিলেন, "বাদশার আমার নিকট কি কার্য্য আছে এবং আমিই বা তাঁহার নিকটে কোন্ কার্য্যের প্রয়াসী? আমি আপনাকে বলিতেছি,

আমাকে অনর্থক বাক্-জালে বিজড়িত করিবেন না।" পারিষদ বলিলেন, "যিনি মহামান্য খলিফা, ইস্লামের রক্ষক ও সুফীসমাজের আশ্রয়, তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নহে?" দরবেশ বলিলেন, "আমাকে ক্লেশ দিবেন না, বিরক্ত করিবেন না।" পারিষদ পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি বাদশার অনুমতিক্রমেই তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।" দরবেশ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? তাহার [illegible] এখানে আসিবার আজ্ঞা হয় নাই। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে এস্থলে আসিতে পারেন।' তখন বাদশাহ্ দরবেশের নিকটে গেলেন। বাদশাকে আসিতে দেখিয়াই তিনি প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন, কেননা তিনি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন।

খলিফা সেই অন্ধকারময় কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। দৈবক্রমে তাঁহার হস্ত দরবেশের হস্তের উপর পড়িল। তাহাকে তিনি কহিলেন, "হস্তখানি অতি সুন্দর ও কোমল বটে, কিন্তু ইহা নরকের ভীষণ অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইলেই মঙ্গল।" এই উক্তির পরেই তিনি নমাজ পড়িতে দাঁড়াইলেন, তখন বাদশাহ্ হতাশের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে বিষম ভয়ের উদ্রেক হইল, নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। নমাজ সাঙ্গ হইলে তিনি

দরবেশকে কহিলেন, "যাহাতে পরলোকে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।" তপোধন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন, আপনার পিতামহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পিতৃব্য ছিলেন। তিনি তাঁহাকে কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ দিবার জন্য হজরতকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে হজরত তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনাকে আপনার মনোরাজ্যের অধিপতি করিলাম: আপনি তাহা খোদা-তা'লার আনুগত্য প্রাপ্তির দিকে চালনা করুন। সহস্র বৎসর পৃথিবীর শাসনভার লাভের অপেক্ষা ইহা কি আপনার পক্ষে উত্তম ও উপযুক্ত নহে?" হারুণ অর-রশীদ ইহা শুনিয়া পুনঃ বলিলেন, "আরও কিছু উপদেশ দিন।" তপস্বী বলিলেন, "ওমর-তনয় আব্দুল আজিজ খলিফা [illegible] রাজ্যস্থ তিন জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বীয় কর্ত্তব্য [illegible] জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে এক জন এইরূপ পরামর্শ দেন যে, যদি শেষবিচার-দিনে শাস্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চান, তাহা হইলে এইরূপ কার্য্য করুন,—বৃদ্ধদিগকে পিতৃবৎ, যুবাগণকে ভ্রাতার সমান, বালকবৃন্দকে পুত্রের তুল্য এবং মহিলামণ্ডলীকে মাতা বা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথাবিধি সদয় ব্যবহার করুন। যাহাতে তাহাদের কুশল সাধিত হয়, তাহাই করিতে থাকুন।" দরবেশ ইহা বিরত করিয়া পুনর্ব্বার

বাদশাকে বলিলেন, “কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, পাছে আপনার সুন্দর মুখখানি নরকানলে দগ্ধ হইয়া যায়। কেননা অনেক চাঁদমুখ সেই অগ্নিতে ছারখার হইয়া যাইবে। অনেক বাদশাহ্ আপনাদের গুরু দায়িত্বের হিসাব দিতে না পারিয়া বন্দী হইবে।” এই কথা শুনিয়া খলিফা হাহাকার রবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মহর্ষি আবার বলিলেন, “অন্তরে খোদার ভয় রাখিও, স্বীয় দায়িত্বের জন্য সতর্ক থাকিও। শেষবিচার দিনে তোমার কার্য্যাবলীর হিসাব দিতে হইবে। সেই সূক্ষ্মদর্শী বিচারপতি সেই মহাবিচার-সভায় তুমি দুনিয়ায় কিরূপ বিচার করিয়াছ, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। আজ যদি কোন বৃদ্ধা আহারাভাবে কষ্ট পায়, তবে কল্য সে তোমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিচারপ্রার্থী হইবে; তোমাকে অভিশাপ দিবে।” ইহা শুনিয়া খলিফা হারুণ-অর-রশীদ উন্মত্তের ন্যায় [illegible] রোদন করিতে করিতে অবসন্ন ও চৈতন্যরহিত হইয়া পড়িলেন। পারিষদ ইহা দেখিয়া দরবেশকে কহিলেন, “আপনি আমীর-উল্-মুমেনিন খলিফা হারুণ-অর-রশীদের প্রাণসংহার করিলেন?” তপস্বী কহিলেন, “হামান! তুমি চুপ করিয়া থাক, বিপরীত কথা বলিতেছ কেন? তুমি এবং তোমার জাতি ইহাকে

নষ্ট করিয়াছে।” বাদশাহ্ অতঃপর শোকার্ত্ত হইয়া পারিষদকে কহিলেন, “তাপস-রাজ তোমাকে হামান বলিয়াছেন, তাহার কারণ আমাকে ফেরাউন জ্ঞান করিয়াছেন।” পরে বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনি কি কাহার নিকট ঋণগ্রস্ত আছেন?” তিনি উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি খোদার নিকট ঋণজালে জড়িত আছি। যদি তজ্জন্য আমার অপরাধ সিদ্ধান্ত হয়, তবে সহস্র অনুতাপের কথা।” এইরূপ কথাবার্ত্তার পর খলিফা এক সহস্র মুদ্রা ফজিলের সম্মুখে দিয়া কহিলেন, “ইহা পবিত্র ও ‘হালাল’ (সদুপায়ে অর্জ্জিত) অর্থ, পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি, গ্রহণে চরিতার্থ করুন।” তিনি বলিলেন, “এত উপদেশ সকলই বৃথা হইল। আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে না; কিন্তু আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে! আমি তোমাকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে চাই, আর তুমি আমাকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছ! তোমার যাহা আছে যাহারা পাইবার প্রার্থী, তাহাদিগকে দান কর। আমাকে দিলে কোনই ফল নাই।” ইহা বলিয়া তপোধন দণ্ডায়মান হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাদশাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। খলিফা হারুণ-অর-রশীদও ফজিলের ন্যায়নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত

ও মুগ্ধ হইয়া সহস্রমুখে তদীয় যশোকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

একদা ফজিল আপন পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিলেন। সহসা পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! আপনি আমাকে ভালবাসেন?" তিনি কহিলেন, "আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি।" পুত্র আবার বলিল, "খোদাকে ভালবাসেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, খোদাকেও ভালবাসি।" তখন ফজিল-তনয় আবার কহিল, "এক মনে দুই জনের ভালবাসা স্থানলাভ করিতে পারে কি? এক স্থানে দুইটী বস্তু থাকা কি সম্ভব?" তাপসরাজ এই কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "নিঃসন্দেহ ইহা খোদার খেলা। খোদা-তা'লার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াই শিশু একথা বলিতেছে; ইহা তাঁহারই উক্তি।" ফজিল ইহা স্থির করিয়া পুত্রকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

এক দিন আরাফাতের ময়দানে ফজিল আয়াজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি লোকদিগের প্রার্থনাজনিত কাতর-ক্রন্দন শুনিয়া কহিলেন, "হে দীন-দুনিয়ার মালিক! ইহারা যদি এইরূপে কোন কৃপণ ব্যক্তির নিকটে গিয়া অর্থাদি চাহিত, তাহা হইলে সে উহাদিগকে বঞ্চিত করিত না। কিন্তু তুমি দয়ালু ও পরম দাতা;

তোমার তুল্য দাতা কেহ নাই। যদি ইহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা কর, তবে প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি ইহাদিগকে মার্জ্জনা করিবে।

এক দিবস রাত্রিকালে সুফিয়ান সুরী ফজিলের ভবনে গিয়া দেখিলেন, তিনি কোর্‌আন শরীফ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুফিয়ান ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দে কহিলেন, "আজিকার রাত্রি অতি সুখময়ী ও মঙ্গল-দায়িনী, অদ্য আপনার সংসর্গ-সুখে কাটাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।" ফজিল কহিলেন, "এই রাত্রির ন্যায় অশুভ রাত্রি আর নাই।" সুফিয়ান বলিলেন, "কেন? এ রজনী মন্দ কি জন্য, বুঝাইয়া বলুন।" তখন মহর্ষি কহিলেন, "কারণ, সমস্ত রজনী শাস্ত্রালাপে কাটিয়া গেল। তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্য যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছ, আমি তাহা হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতেছি এবং কিরূপ তোমার প্রশ্নের সদুত্তর দিব, এই চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কার্য্য হইতে তফাৎ হইয়াছি—খোদাচিন্তা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং এরূপ সংসর্গে থাকা অপেক্ষা একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকা সহস্রাংশে উত্তম ও প্রার্থনীয়। তাই বলিতেছি, এই রজনী অতি অশুভ, সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে।"

মহাত্মা ফজিল আয়াজের ক্রিয়াকলাপ এইরূপ

অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক,—শুনিলে চমকিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়! তিনি প্রার্থনাকালে বলিতেন, "হে খোদাওন্দ করিম! তুমি আমাকে ও আমার পরিজনবর্গকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছ; রাত্রিতে আলোকও দাও না। যাঁহারা তোমার প্রেমিক, তুমি যুগে যুগে তাঁহাদেরই সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাক! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—হে করুণাময়! আমার এমন কি গুণ আছে যে, তদ্দ্বারা আমি এই সুখসম্পদ প্রাপ্ত হইলাম?"

কথিত আছে যে, ফজিলকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ হাস্য করিতে দেখে নাই। পরে যখন তাঁহার প্রিয় পুত্রের মৃত্যু ঘটে, সেই দিন তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যময় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে বলেন, "এই কি তোমার হাসিবার সময়? আর এত দিন পরে আর এ হাসির উদ্দেশ্যই বা কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "আমি বুঝিলাম, আমার এই প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে খোদার সম্মতি আছে। অগত্যা আমিও হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মতিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। আল্লাহ্ যাহাতে সন্তুষ্ট, আমার কি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত?"

মহর্ষির দুইটী দুহিতা বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর পরে

আমাকে কবরস্থ করিয়া তুমি কন্যা দুইটীকে লইয়া আবুকবিস্ পর্ব্বতে গমন করিবে। তথায় আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আমারই কথায় তুমি প্রার্থনা করিবে, "হে করুণাময় খোদা-তা'লা! আমি জীবিত কাল পর্য্যন্ত যথাশক্তি ইহাদের লালন-পালন করিয়াছিলাম; এখন আমি বন্দী, কবর-কারায় তুমি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, সুতরাং এই নিরাশ্রয়াদিগকে তোমারই উপর সমর্পণ করিলাম।" তাঁহার বিবি স্বামীর মৃত্যুর পর পর্ব্বতে গিয়া এই উপদেশানুসারে কার্য্য করেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ও প্রার্থনায় সেই স্থান শব্দায়মান হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে ভক্তরঞ্জন ভবপতিও নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারই কৌশলক্রমে ইমনের বাদশাহ্ আপনার দুই পুত্র সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই পুণ্যশীলা মহিলার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। ইমনেশ্বর তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আশ্রয় দানে কহিলেন, "এই দুই কন্যার সহিত আমার এই দুই পুত্রের বিবাহ দিতে বাসনা করি।" তিনি সহর্ষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর বাদশাহ্ পরম যত্নে তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া সেই সুন্দরী কন্যা দুইটীর সঙ্গে মহা-ধূমধামে তাঁহার দুই পুত্রের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এই তেজস্বী তাপস ১৮৭ হিজরীতে পবিত্র রাবয়ল-আউয়ল মাসে পরলোক গমন করেন এবং পুণ্যভূমি মক্কার 'জিন্নাতুল মোয়াল্লা' নামক সমাধি-ক্ষেত্রে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

———

তপস্বী বশর হাফী

যে মহাত্মা আল্লাহ্-তা'লার অপার কৃপায় উত্তর-কালে পুণ্যাত্মা স্নফী নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন, যিনি কঠোর ধ্যান-ধারণায় অবিচল ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানে প্রভাকর সদৃশ তেজস্বী ছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থার কথা স্মরণ করিলে অন্তরে বিস্ময়ের উদয় হইয়া থাকে। সেই পুণ্যাত্মা বশর হাফী মরও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বোগ্দাদবাসী হইয়াছিলেন। বাল্যজীবন হইতে যৌবনের অধিকাংশ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মে-কর্ম্মে কিছুমাত্র মতিগতি ছিল না,—নিয়ত কুসংসর্গে থাকিয়া অনন্ত আমোদোৎসবে লিপ্ত থাকিতেন।

বশর হাফী অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন ; মদ্য-মাংস ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও চলিতেন না। স্নরাপানে উন্মত্ত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন ; জন-সাধারণে তাঁহাকে এক জন অসচ্চরিত্র মন্দ লোক ভিন্ন অপর কিছুই বলিয়া জানিত না। কিন্তু সেই সম্ভব-অসম্ভবের একমাত্র বিধাতা যাহার প্রতি সদয় হন, ইহলোকের অপযশঃ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে

তাহার আর কতটুকু সময় লাগে? একদা কদাচারী বশর হাফী উন্মত্ত অবস্থায় যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, পথের উপর এক খণ্ড কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। কি ভাবিয়া তিনি সেই কাগজখানি তুলিয়া লইয়া ধূলিমুক্ত করিলেন। পরে অর্দ্ধমুদিত নয়নদ্বয় খুলিয়া দেখেন, তাহাতে আল্লাহ্-তা'লার সুপবিত্র নাম লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি ত্রস্ততার সহিত একান্ত ভক্তি সহকারে যথোচিত সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়া সেই পত্র-লিখিত সুপবিত্র নাম পাঠ করিলেন এবং অতঃপর মূল্যবান আতর ক্রয় করিয়া উক্ত কাগজ-খানি তাহাতে ভিজাইয়া গৃহে যত্নে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে সূক্ষ্মদর্শী, সদ্বিচারক ও পরম দাতা আল্লাহ্-তা'লা সেই দিবস রাত্রিতে বোগ্দাদবাসী এক জন দরবেশকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—"তুমি কল্য প্রত্যূষে বশর হাফীর নিকটে গিয়া তাহাকে কহিবে,— তুমি যেরূপ যত্ন-সহকারে খোদা-তা'লার পবিত্র নামের সম্মান রক্ষা করিয়াছ, ধূলি হইতে তুলিয়া পবিত্র অবস্থায় রাখিয়াছ, সুগন্ধি আতর প্রদানে সুরভিত করিয়াছ, আল্লাহ্-তা'লা তজ্জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তোমার কার্য্যের পরিবর্ত্তে জগতে তোমার যশঃ ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়া এবং তোমার অন্তর হইতে অপবিত্রতার মূল উৎপাটন করিয়া তোমাকে পবিত্র অবস্থায় আনিবেন।

তুমি ইহলোকে ধন্য ও পরলোকে পুণ্যের অধিকারী হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে।”

দরবেশ এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। বশর হাফীর দুশ্চরিত্রতার কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিলেন, এ স্বপ্ন অমূলক—ভিত্তিহীন; দুরাচার পাপী ব্যক্তি কি এমন দৈবানুগ্রহের যোগ্য হইতে পারে? ইহা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্তু পর দিবস আবার সেই স্বপ্ন। তিনি এ স্বপ্নও উপেক্ষা করিলেন। এবার ভাবিলেন, ইহা প্রথম দিনের স্বপ্ন-দর্শনের তোলাপাড়ার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নিরুদ্বেগে নিয়মিত সময়ে শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই সময়ে আবার সেই স্বপ্নাদেশ! এবার তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জাগরিত হইয়া “ইহা নিঃসন্দেহ দৈবাদেশ, উপেক্ষা করিয়া ভাল করি নাই; মহা অপরাধ করিয়াছি। হায়, আমার এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে।” এইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

পর দিবস প্রত্যূষে ফজরের নমাজ পড়িয়া তিনি বশর হাফীর সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! বালক যুবা বৃদ্ধ, যাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সেই-ই বলে, “বশর হাফীকে আপনার প্রয়োজন? সে

সুরাপানে রঙ্গালয়ে বিভোর হইয়া পড়িয়া আছে।” ইহা শুনিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, বশর হাফীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক জন প্রতিবাসীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বশর হাফী মত্ততাবস্থায় প্রতিবাসীকে কহিলেন, “আগন্তুক কি জন্য আসিয়াছেন, জানিয়া আইস!” সে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আগমনের কারণ শুনিয়া গিয়া কহিল, “তিনি তোমার জন্য খোদার সুসমাচাব আনিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া বশর হাফীর দুই চক্ষু হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, হৃদয় কি যেন এক গুরুভারে দমিয়া গেল। ভাবিলেন, হয়তো খোদার শাস্তির সমাচার আসিয়াছে। তখন তিনি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সহচরদিগকে বিদায় দিয়া কহিলেন, “ভাই সকল! এই বিদায় চির বিদায়, আর তোমরা আমাকে এই অসৎ কার্য্যে লিপ্ত দেখিতে পাইবে না।” ইহা বলিয়া দ্রুতপদে সেই নরক সদৃশ অপবিত্র স্থান হইতে বাহির হইলেন এবং দেল্‌জানে ‘তওবা’ করিয়া সুরাপান ত্যাগ করিলেন। ফলতঃ “খোদার শুভ সংবাদ আসিয়াছে!” এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয় উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান হইয়াছিল! জ্ঞাননেত্র বিকশিত হওয়ায় সুরার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে

তিনি গভীর অনুশোচনার সহিত গত অপরাধের জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং এমনই হইলেন যে, আহার নিদ্রা বিহার বিশ্রামাদির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া আল্লাহ্-তা'লার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। একে দৈবানুগ্রহ, তাহাতে আবার নিজে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; সুতরাং ঐশিক তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহার আর অধিক বিলম্ব হইল না।

এই সময় হইতে বশর হাফী অসৎ কার্য্যের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না। তিনি সাধারণের ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান আকর্ষণের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। লোকে তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র সাদর সম্ভাষণে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এইরূপে এক জন পাপ-ম্লান হীন ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মশীল নামে পরিগণিত হইলেন। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তাই বলিয়াছি, খোদার কৃপা হইলে অসম্ভব সম্ভব হইতে আর অধিক সময়ের আবশ্যক করে না। কত কাল হইল, মহাত্মা বশর হাফী মানবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহার দেহ কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম স্বদেশ-বিদেশের সর্ব্বত্রই সাহিত্য, ইতিহাস ও কবি-গাথায় গীত ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইতেছে এবং চিরকাল হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বশর হাফী এইরূপে উন্নত জীবন লাভ করিয়া

আল্লার নামে আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে খোদা-চিন্তায় এরূপ মগ্ন থাকিতেন যে, অপর কোনও বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা দূরে থাক, নিজ বেশ-বিন্যাসের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি অতঃপর পাদুকা পরিধান করেন নাই এবং তজ্জন্যই সাধারণে তাঁহাকে হাফী অর্থাৎ পাদুকাহীন নাম দিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে পাদুকা গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "যে দিন 'তওবা' করিয়া আল্লার উপর আত্মসমর্পণ করি, তখন আমার পদদ্বয় পাদুকাশূন্য ছিল, সেই জন্য এখন পাদুকা পরিতে লজ্জা বোধ হয়। আরও আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন,—এই বিস্তীর্ণ ধরাতল তোমাদের আস্তরণস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সেই শাহী শয্যায় পাদুকা পরিয়া গমনাগমন করা যুক্তিযুক্ত নহে। অনেক সাধক পুরুষ মৃত্তিকায় প্রস্রাব করিতেন না এবং থুথু ফেলিতেন না! কারণ তাঁহারা ভূতলেও খোদার 'নূর' (জ্যোতি) নিরীক্ষণ করিতেন।" বশর হাফী তপস্যায় তন্ময় হইয়া এরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক যাঁহারা বিশাল সাধন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কূল প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের এই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা খোদার নূর ভিন্ন দুনিয়ার অপর কিছুই দেখিতে পান না। সেই জন্যই শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ

মোস্তফা সালেরা নামক এক ব্যক্তিকে কবর দিবার কালে অতি সাবধানে পদাঙ্গুলিতে ভর দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়াছিলেন, "আমার ভয় হইতেছে, পাছে ফেরেশ্‌তার উপর আমার পদ পতিত হয়। কেননা ফেরেশ্‌তারাও খোদার নূর স্বরূপ।"

কথিত আছে, এক দিবস নিশাকালে সাধুবর গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন ; কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া গৃহমধ্যে না গিয়া এক পদ গৃহের ভিতরে এবং অন্য পদ বহির্দ্দেশে স্থাপন করিলেন এবং সেই অবস্থায় প্রভাত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি অলৌকিক সহিষ্ণুতা! প্রকৃত সাধক ব্যতীত কি এ কার্য্য অন্যের দ্বারা সাধিত হইতে পারে ?

বশর হাফীর এক সহোদরা ছিলেন। একদা তিনি সেই ভগিনীর গৃহে গিয়া ছাদে উঠিতেছিলেন, কিন্তু সোপানশ্রেণীর কতিপয় ধাপ পার হইয়া আর পদোত্তোলন করিলেন না : উদাস-নয়নে এক দিকে চাহিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে প্রাভাতিক নমাজ সাঙ্গ করিয়া ভগিনীর নিকট আসিলে তিনি সেই ঘটনার কারণ জানিতে চাহিলেন। বশর হাফী কহিলেন, "বোগদাদ নগরে আমার নামে কয়েক জন লোক বাস করে। তাহারা সকলেই বিধর্ম্মী আর আমি মুসলমান। তাহারা কি জন্য ইস্‌লামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নরকের

দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর আমিই বা কি এমন পুণ্য কার্য্য করিয়াছি যে, তদ্দ্বারা ইস্লাম রূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইলাম? ভগিনি! এই ভাব মনে হওয়ায় আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

বেলাল খাওয়াস্ নামে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আমি এক দিন বনি ইস্রাইলের জঙ্গলে গমন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুণ্যাত্মা খাজা খেজর হইবেন। আমার এই অনুমান যথার্থ কি না, জানিবার জন্য কহিলাম, "হুজুর! আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন?" তিনি কহিলেন, "আমি তোমার ভ্রাতা খেজর।" খেজরের নাম শ্রবণে আমি সালাম করিয়া কহিলাম, "ধর্ম্ম বিষয়ে হজরত ইমাম শাফীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?" উত্তর করিলেন, "তিনি এক জন উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন উপদেষ্টা।" পুনঃ কহিলাম, "হজরত আহ্মদ হাম্বল?" খেজর বলিলেন, "হাম্বল দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসী পুণ্যাত্ম ব্যক্তিদিগের অন্যতম!" আমি অবশেষে কহিলাম, "বশর হাফী কেমন লোক?" তিনি বলিলেন, "বশর হাফীর পরে তাঁহার মত অপর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মিবে কি না সন্দেহ।" এইরূপ

আরও অনেক ধার্ম্মিক লোক বশর হাফীর অনেক প্রশংসার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি এক দিন বশর হাফীর নিকট উপবেশন করিয়াছিলাম। সে দিবস শীতের বড়ই প্রভাব ছিল। তিনি সেই প্রবল শীতে গাত্রে বস্ত্রাদি না দিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। আমি তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কহিলাম,—এ আপনার কিরূপ ভাব, বুঝিতে পারিলাম না! তিনি প্রসন্নমুখে উত্তর করিলেন,—আমি এতদ্দ্বারা দরবেশদিগকে স্মরণ করিতেছি। অর্থাদির দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিবার শক্তি আমার নাই; তাই তাঁহাদের ন্যায় নগ্নদেহ হইলাম। আমি পুনঃ বলিলাম,—আপনি এই পরম পদ কি প্রকারে লাভ করিলেন? তিনি বলিলেন,—ইহার একমাত্র কারণ, আমি স্বীয় অবস্থা সেই খোদা ভিন্ন অপর কাহাকেও জানিতে দিই নাই। বাস্তবিক, খোদা ব্যতীত অপরের নিকট আত্মকথা প্রকাশ করিলে কি ফল হইতে পারে?"

এক সময় কতিপয় জ্ঞানী লোক বশর হাফীর নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, "যদি কেহ স্বেচ্ছায় আপনাকে কোন দ্রব্য দিতে আইসে, তবে আপনি তাহা গ্রহণ করেন না কেন? জানি, আপনি সংসার-নির্লিপ্ত সাধু

ব্যক্তি ; কিন্তু তাহা হইলেও লোকের সন্তুষ্টির জন্য তাহা গ্রহণ করিয়া দীন-দুঃখীদিগকে বিতরণ করুন না কেন ?” বশর হাফীর শিষ্যমণ্ডলীর এই কথা ভাল লাগিল না ; কিন্তু সরলচিত্ত বশর হাফী অম্লানবদনে কহিলেন, “শোন বলি, জগতে ফকীর তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের ফকীর কখন কাহারও দ্বারস্থ হন না, কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না এবং কেহ কোন দ্রব্য প্রদান করিলে গ্রহণ করা দূরে থাক, বরং রাগান্বিত হইয়া পলায়ন করেন। এই শ্রেণীর ফকীরসকল খোদার প্রেমে মাতোয়ারা। ইঁহারা খোদার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, দয়াময় অবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। দ্বিতীয় প্রকার, যাঁহারা কাহার নিকট ভিক্ষার্থী নহেন, কিন্তু কিছু কিছু দিলে গ্রহণ করেন। ইঁহারা মধ্যম শ্রেণীর ফকীর। ইঁহারাও খোদার উপব নির্ভর করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করেন, আখেরে খোদার ‘দিদার’ (দর্শন) প্রাপ্ত হইবেন। তৃতীয়তঃ, ধৈর্য্যশীল ফকীরের দল ; ইঁহারা স্বীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদার নামে স্থির বিশ্বাসে পড়িয়া থাকেন।” এই জ্ঞানগর্ভ উত্তর শুনিয়া সকলে প্রফুল্লবদনে বশর হাফীকে কহিলেন, “আমরা আপনার বাক্যে পরম আনন্দ পাইলাম।”

শ্যাম (সিরিয়া) প্রদেশ হইতে এক দল লোক বোগদাদে

উপনীত হন। তাঁহারা মহর্ষি বশর হাফীকে কহিলেন, "হজ্‌ব্রত পালনার্থ আমরা মক্কাধামে যাইতে অভিলাষ করিয়াছি; আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।" তাপসপ্রবর বলিলেন, "তিন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে আমি তোমাদের সহিত গমন করিতে পারি। প্রথম, অর্থ ও খাদ্য দ্রব্য কিছুই সঙ্গে লইতে পারিবে না; দ্বিতীয়, কোনও ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিতে পারিবে না এবং তৃতীয়, কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বস্তু দিলেও লইবে না। এই তিনটী বিষয় যদি পালন কর, তাহা হইলে আমার যাইতে আপত্তি নাই।" তাঁহারা কহিলেন, "আমরা প্রথমোক্ত বিষয় তুইটী রক্ষা করিব, কিন্তু তৃতীয়টী পালন করিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া তাপস বলিলেন, "এখন আমি স্পষ্ট বুঝিলাম, তোমরা হাজীদের পাথেয় অর্থের ভরসায় চলিতেছ। কাহারও নিকট কোন বস্তু লইব না, ইহা যদি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তবে তাহাকেই খোদার প্রতি নির্ভর করা বলে এবং আমিও তাহাই বলিয়াছি।"

বশর হাফীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, "আমার বৈধ উপায়ে লব্ধ তুই সহস্র মুদ্রা আছে। বাসনা, তদ্দারা হজ্‌ক্রিয়া নির্ব্বাহ করি, ইহাতে আপনার পরামর্শ জানিতে চাই।" তিনি কহিলেন, "আমোদ-প্রমোদের জন্য তোমার মক্কাতীর্থে যাইতে ইচ্ছা। কিন্তু যদি

খোদা-তা'লার কৃপা লাভের জন্য তথায় যাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে সেই অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দাও। তদ্দ্বারা তাহারা অভাবের ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া তোমাকে 'দোওয়া' করিবে। একার্য্য তোমার শত শত হজ্ হইতেও উত্তম ও পুণ্যপ্রদ।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "হজ্ব্রত পালন করাই আমার ইচ্ছা।" তখন বশর হাফী কহিলেন, "বুঝিলাম, তোমার এই অর্থ বৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত নহে ; নতুবা অকারণে অপব্যয় করিতে ইচ্ছা করিবে কেন?"

তাপসপ্রবর যখন অন্তিম দশায় উপস্থিত, সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার দুঃখ-দরিদ্রতার কথা বলিয়া একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করে। পরদুঃখকাতর বশর হাফী তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপনার পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলিয়া তাহাকে দান করিলেন। পরে আপনার নগ্ন দেহ ঢাকিবার জন্য অপর এক ব্যক্তির নিকট একখানি বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব ঘটনা! সাধুবর সেই বস্ত্রে অঙ্গাবৃত করিয়া অসার দেহবাস ত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণ চির সুখধামে প্রস্থান করিলেন।

বশর হাফীর সাধুতা জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনি জীবনে

অনেক কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বোপদেশপূর্ণ মধুর প্রবচনসমূহ পাঠ করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তির আবির্ভাব হয় এবং অন্তর ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কোটি কোটি মানব সময়-সাগরে জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ উত্থিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু সেই মহাপুরুষ লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া চিরদিন সমভাবে জনগণের ভক্তি, ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন।

দরবেশ আবু হেফ্‌স্‌

দরবেশ আবু হেফ্‌স্‌ খোরাসান নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মভীরু তেজস্বী সাধু অপর কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও তদনুরূপ প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, সাধুতা প্রভৃতি গুণে আবু হেফ্‌স্‌ সকল সমাজেই সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনলাভার্থ প্রসিদ্ধ তাপস শাহ্‌ শুজা কেরমান প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি অনেক সাধুসহবাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি মন্দ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, মন্দমতি দুষ্ট লোকেরা তাঁহার সহচর ছিল। কিরূপ অপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভ ঘটে, কিরূপে তিনি পাপ-পথ পরিহার করিয়া পুণ্য-পথের পথিক হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

একদা আবু হেফ্‌স্‌ একটী সুন্দরী যুবতীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন। দারুণ কামানলে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তিনি সেই সুন্দরীকে পাইবার

জন্য দিবানিশি উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতেন। তাঁহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ছিল না ; কি উপায়ে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, নিয়ত সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু অশেষবিধ প্রলোভন-জাল ও কৌশল বিস্তার করিয়াও তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন নিরুপায় আবু হেফ্‌স্‌ একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে সংসার কালানলপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল ; সুখশান্তি, আশা-ভরসা সমস্তই জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া তিনি এক অদ্ভুত জীবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

এক ব্যক্তি তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সদুঃখে কহিল, "যুবক! নেশাপুরে যাও, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তথায় এক জন ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিশারদ ইহুদী বাস করে। তাহার নিকটে মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে সে মন্ত্র-প্রয়োগে তোমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিবে।" ইহা শুনিয়া আবু হেফ্‌স্‌ প্রফুল্লমনে নেশাপুরে গমন করিলেন। তথায় সেই ইহুদীর ভবনে উপনীত হইয়া আপনার দুরবস্থার বিষয় বিবৃত করিলেন এবং স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক অভয় দিয়া কহিল, "ইহা তো অতি সামান্য কার্য্য, ইহার জন্য অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার উপদেশ

মত কার্য্য করিলেই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার যদি ধর্ম্মকার্য্য করার অভ্যাস থাকে, তবে তাহা একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করা দূরে থাক, মনেও স্থান দিতে পারিবে না। এইরূপে চল্লিশ দিবস গত হইলে আমি মন্ত্র প্রয়োগ করিব ; সেই মন্ত্রবলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।”

আবু হেফ্‌স্‌ ঐন্দ্রজালিকের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎ-পালনে স্বীকৃত হইলেন এবং চল্লিশ দিন সেই কঠোর নিয়ম পালন করিয়া তাহার নিকটে পুনরাগমন করিলেন। ঐন্দ্রজালিক ইহুদী আবু হেফ্‌স্‌কে নিকটে বসাইয়া যথানিয়মে তাঁহার উপর মন্ত্র-প্রয়োগ করিল ; কিন্তু মন্ত্র বিফল হইয়া গেল, কিছুতেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হইল না। তখন ইহুদী দুঃখিত হইয়া কহিল, “যুবক, নিশ্চয়ই এই চল্লিশ দিবস মধ্যে তুমি কোন সৎকর্ম্ম করিয়াছ। নতুবা আমার মন্ত্র তো কোনক্রমেই বিফল হইবার নহে! তুমি এই চল্লিশ দিনের কাজ স্মরণ করিয়া দেখ।” আবু হেফ্‌স্‌ নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন, “আমি ইহার মধ্যে এমন কোন সৎ কাজ করি নাই ; তবে এক দিন দেখিলাম, পথিমধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর ছিল, পাছে উহা কাহার পায়ে লাগিয়া বেদনা প্রদান করে, ইহা ভাবিয়া উহা স্থানান্তরিত

করিয়াছিলাম মাত্র। ইহা ভিন্ন আমি অন্য কোন সৎ কাজ করি নাই বা কাহার কোন সৎকর্ম্মের সহায় হই নাই।" তখন ইহুদী হাসিয়া বলিল, "যুবক! আর তুমি খোদা-তা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না। এই চল্লিশ দিবস তুমি আমার আদেশে তাঁহার মঙ্গলময় আজ্ঞা অমান্য ও অবহেলা করিয়াছ। কিন্তু দেখ, তিনি কেমন দয়াময়। স্বেচ্ছায় কোন কার্য্য না করিলেও, কার্য্য যেরূপেই সম্পন্ন হউক, তিনি কার্য্য-কর্ত্তাকে তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তুমিই ইহার এক জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। তুমি যে ক্ষুদ্র পুণ্যকার্য্যটী করিয়াছ, তাহারই জন্য আজ আমার মন্ত্রবল ব্যর্থ হইয়া গেল এবং তুমিও এক পাপকার্য্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে। দেখ দেখি, তাঁহার কত দয়া! ক্ষণিক সুখের জন্য সেই সর্ব্বসুখদাতা খোদার বিরুদ্ধাচরণ ও নিত্য সুখের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে।"

ইহুদীর মুখে এই কথা শুনিয়া আবু হেফ্‌সের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের অনল হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি কাতর ক্রন্দনে "হায়, আমি কি করিলাম!" বলিয়া কত অনুতাপ করিতে লাগিলেন

এবং ইহুদীর সম্মুখেই পাপকার্য্যে চিরবিরত থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার জীবনগতি ধর্ম্মের দিকে ছুটিল। তিনি যে রত্ন লাভের জন্য এত দিন লালায়িত ছিলেন, যাহার কারণে এই দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ তাহা তাঁহার চক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত, অসার ও অপদার্থ বলিয়া বোধ হইল। আজ তিনি তাহার পবিবর্ত্তে মহামূল্য নিত্য ধনের উদ্দেশ পাইয়া তৎলাভে মনোনিবেশ করিলেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পীড়িতের রোগসেবা ইত্যাদি পরোপকাবে জীবনোৎসর্গ করিলেন। তিনি ধর্ম্মবিধি পালন ও নির্জ্জনে বন্দেগী করিয়া এরূপ উন্নত জীবনলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমকালে তিনি লোকসমাজে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং পরিণামে দরবেশশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া জগতের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

আবু হেফ্‌স্‌ কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জীবনের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহার একটী করিয়া 'দিনার' লাভ হইত; কিন্তু এই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না, প্রত্যহ

সন্ধ্যাকালে দীন দরবেশদিগকে দান করিয়া দিতেন। তাঁহার দান-ক্রিয়া অতি সঙ্গোপনে সংসাধিত হইত। তিনি উপায়হীনা দীনা স্ত্রীলোকদিগের গৃহ মধ্যে তাহাদের কষ্টের লাঘব মানসে অতি গুপ্তভাবে অর্থ নিক্ষেপ করিতেন। কে তাহা নিক্ষেপ করে? সহস্র যত্নেও তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তিনি বারো মাস রোজা করিতেন। জলাশয়ে খাদ্যাদি ধৌতকালে লোকের পাত্র হইতে যে কিছু সামান্য অংশ ঝরিয়া পড়িত, তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তিনি ক্ষুধার শান্তি করিতেন। এইরূপে বহু কষ্টে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করার পর একদা একটী অন্ধ লোক প্রকাশ্য পথ দিয়া একটী কবিতা পাঠ করিতে করিতে গমন করিতেছিল। একে তাহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, তাহাতে আবার কবিতাটী অতীব সদ্ভাবপূর্ণ; সুতরাং মহর্ষি তন্ময় হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে এমনি বিভোর ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, সেই প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড (হাপর) হইতে লোহিতবর্ণ প্রতপ্ত লৌহ হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করত নেহাই উপরে স্থাপন করিলেন। অপর কারিকরগণ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না; পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন,

"তোমরা লৌহ পিটাও।" তাহারা বলিল, "পিটাইব কোথায়? আপনার হস্ত তুলিয়া লউন।" অনন্তর সাধুপ্রবরের জ্ঞানের সঞ্চার হইল, দেখিলেন হস্তে উত্তপ্ত লৌহ ধরিয়াছেন। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া ত্রস্ততার সহিত উহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দোকানের যাবতীয় দ্রব্যজাত বিতরণ করিয়া দিয়া কহিলেন, "অনেক দিন হইতে আমার বাসনা যে, এই কার্য্য হইতে পৃথক হইব, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে এই পবিত্র শ্লোক আমাকে বিনা ক্লেশে ইহা হইতে অবসর প্রদান করিল। আমি কার্য্য হইতে হস্ত উঠাইয়া লই নাই, কিন্তু কার্য্য আমা হইতে হাত উঠাইয়া লইল! আমার কোন ফললাভ হইল না।" অনন্তর তিনি কঠোর যোগ সাধনার্থ নিয়ত নির্জ্জন-নিবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার জনৈক প্রতিবাসীর গৃহে শাস্ত্র আলোচনার্থ এক সভা হয়। তিনি সেই সভায় যোগদান না করায় কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, "আপনি ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেছেন না কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ত্রিশ বৎসর হইতে শাস্ত্রের একটী মাত্র কথা পালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সমর্থ হইলাম না। এমত স্থলে শাস্ত্রের অপর প্রসঙ্গ শুনিয়া কি করিব?" সে ব্যক্তি কহিল, "সেই কথাটী কি?

শুনিতে বাসনা করি।” তখন তিনি প্রফুল্লবদনে সেই শাস্ত্রীয় বচনটী আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন।

একদা মহর্ষি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সকলেই পরমানন্দে জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোথা হইতে একটী হরিণ তাপসরাজের নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার ক্রোড়ের উপর ধীরভাবে আপন মস্তক স্থাপন করিল। তাহাতে মহর্ষি আকুল হইয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করিতে এবং উন্মত্তের ন্যায় আপনার দুই গণ্ডস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। হরিণ দীন নয়নে মহর্ষির এই অবস্থা দেখিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জঙ্গল অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। শিষ্যগণ এই ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে আবু হেফ্স্ মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার অন্তরে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, যদি এখানে একটী ছাগ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার মাংস রন্ধন করতঃ সকলের ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, কাহাকেও আর ক্লেশ পাইতে হইত না। এই চিন্তার পরমুহূর্ত্তেই আল্লাহ্-তা’লার আদেশে হরিণ আসিয়া উপস্থিত হয়।” তখন শিষ্যেরা কহিলেন, “বিশ্বস্রষ্টার সহিত যাঁহার ঈদৃশ প্রেম ও সৌহার্দ্দ্য, তিনি আবার করুণস্বরে প্রার্থনা করেন কি জন্য?” তিনি কহিলেন, “তোমরা অবোধ, বুঝিতেছ

না, ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হওয়া আর দ্বার হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া, উভয়ই সমান। যদি পাপী-শাস্তা বিশ্ববিধাতা মিসর-রাজ ফেরাউনের মঙ্গল কামনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে নীল নদের পরিবর্ত্তন সাধিত হইত না।”

এক দিন এক ব্যক্তিকে অবশাঙ্গে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তপস্বিপ্রবর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তি তাঁহার পদপ্রান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—“হায়, আর কি বলিব, আমার সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে! বিষয়-বিভবের মধ্যে আমার একটীমাত্র গর্দ্দভ ছিল, সেই গর্দ্দভটী হারাইয়া গিয়াছে। আমি তাহার অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণত্বে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী আল্লাহ্‌-তা’লাই জানেন!” ইহা বলিয়া সেই দীন ব্যক্তি হাহাকার করিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। তপোধন তদ্দর্শনে অতীব দয়ার্দ্র হইলেন এবং দৃঢ়কায় শালবৃক্ষের ন্যায় সেই স্থলে দণ্ডায়-মান হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন,—“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি আপনার অপহৃত গর্দ্দভ পুনঃপ্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই স্থান হইতে আপন পদদ্বয় উত্তোলন করিব না, ভ্রমেও ইহার ব্যতিক্রম

ঘটিবে না।" মহর্ষি এইরূপ কঠোর অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন, কিন্তু ভক্তের আব্দারে ভক্তরঞ্জন ভুবনেশ্বর কি বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন? সেই লীলাময়ের কৌশলে অপহৃত গর্দ্দভ মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা হইতে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। তখন সেই রোরুদ্য-মান দীন ব্যক্তি আপন গর্দ্দভ লইয়া হাস্যমুখে প্রস্থান করিল; মহর্ষিও প্রেমময়ের মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন।

আবু ওস্‌মান জেরী বর্ণনা করিয়াছেন,—"আমি এক দিন একাকী মহর্ষি আবু হেফ্‌সের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখভাগে কতকগুলি দ্রাক্ষাফল পতিত রহিয়াছে। আমি তন্মধ্য হইতে একটী ফল তুলিয়া লইয়া মুখে নিক্ষেপ করিলাম। আবু হেফ্‌স্ তদ্দর্শনে অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সত্বরতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া সজোরে আমার গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "অপরাধি! তুমি আমার ফল খাইলে কি জন্য?" আমি কহিলাম, "আমার বিশ্বাস ও ধারণা যে, ফল খাইলে আপনি আমাকে কিছুই বলিবেন না এবং আরও অবগত আছি যে, আপনার যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমুদয় পরোপকারার্থ বিতরণ করিতে পারেন। এই সাহসেই বিনানুমতিতে আমি ফল ভক্ষণ করিয়াছি।" তপস্বী এই উত্তর শ্রবণ করিয়া

গম্ভীরভাবে কহিলেন, "রে অজ্ঞান! আমি স্বয়ং আমার মনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, তুমি করিলে কিরূপে? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, বহু দিবস হইতে আমার অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইতেছি না। যে আপনার মনের অবস্থা বিদিত নহে, সে আবার অপরের মনোভাব কিরূপে জানিতে পারিবে!"

একদা আবু ওস্‌মান নামক এক ব্যক্তি মহর্ষিকে বলেন,—"আমার ইচ্ছা, আমি এক্ষণে সাধারণ্যে ধর্ম্ম-কথা প্রচার ও উপদেশ প্রদান করিয়া ভ্রমণ করি।" ইহা শুনিয়া তপোধন কহিলেন,—"কি কারণে তোমার অন্তরে এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে?" তিনি কহিলেন, —"বিধাতার সৃষ্ট মানবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন জন্য।" আবু হেফ্‌স্‌ কহিলেন,—"সাধারণের উপরে তোমার দয়া কি পর্য্যন্ত আছে?" আবু ওস্‌মান নতভাবে কহিলেন,—"আমার এত দূর দয়া আছে যে, যদি খোদা-তা'লা মুসলমান ভ্রাতৃগণের পরিবর্ত্তে আমাকে নরকা-নলে নিক্ষেপ করেন, তবে আমি তাহাতেও সম্মত ও প্রস্তুত আছি।" ইহা শ্রবণান্তে আবু হেফ্‌স্‌ প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—"এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম-কথা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পার। কিন্তু সাবধান, যখন উপদেশ দিবে, তখন শরীর ও মনকে শান্ত রাখিও; তোমার উপদেশ-

সভায় বহু লোকের সমাগম হইলে আত্মগরিমায় উৎফুল্ল হইও না। কেননা লোকে প্রকাশ্যে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং সেই অন্তর্য্যামী বিশ্বনাথ গুপ্তভাবে তোমার অন্তরের ভাব নিরীক্ষণ করিবেন।" এই অমূল্য হিতবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আবু ওস্‌মান সভায় গমনান্তর উপদেশ প্রদানার্থ বেদীর উপর উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সকলেই ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে মনোনিবেশ করিলেন, এদিকে আবু হেফ্‌স্‌ও সভার এক প্রান্তভাগে অলক্ষ্যে উপবেশন করিয়া রহিলেন। যখন উপদেশ সাঙ্গ হইয়া গেল, সেই সময়ে জনৈক অতি দরিদ্র ভিক্ষুক দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণের নিকট বিনয়নম্র বচনে একখানি বস্ত্র ভিক্ষা চাহিল। আবু ওস্‌মান ভিক্ষুকের প্রার্থনা শ্রবণ মাত্র দয়ার্দ্র হইয়া আপনার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে দিলেন। দানকার্য্য সাঙ্গ হইতে না হইতেই আবু হেফ্‌স্ দণ্ডায়মান হইয়া ওস্‌মানকে কহিলেন, "মিথ্যাবাদি! বেদী হইতে নামিয়া আইস।" ওস্‌মান কহিলেন,—"কি জন্য মিথ্যাবাদী হইলাম?" মহর্ষি কহিলেন,—"তুমিই না বলিয়াছিলে যে, মানব-জাতির উপর তোমার অত্যধিক দয়া? দানকালে তোমার সে দয়া কোথায় রহিল? যাহাতে স্বয়ং পুণ্যাধিকারী হইতে পার, তজ্জন্য তুমি সর্ব্বাগ্রে দানকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে;

সকলকে তাহাতে বঞ্চিত করিলে। যদি বাস্তবিকই মানবজাতির কল্যাণ কামনা করিতে, তাহা হইলে এ কার্য্য সত্বর সম্পাদন না করিয়া তাহাদিগকে সুবিধা-দানের জন্য তোমার বিলম্ব করা উচিত ছিল। সেই বিলম্ব হেতু হয়তো কোন ব্যক্তি দান করিয়া আজ এই পুণ্যের অধিকারী হইতে পারিত। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ইহাতে তুমি মিথ্যাবাদী হইলে কি না? মিথ্যাবাদীর জন্য বেদীর সৃষ্টি হয় নাই; ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষই তাহার যোগ্য।"

তদন্তর মহর্ষি আবু হেফ্‌স্‌ হজ্‌ব্রত পরিপালনার্থ পবিত্র মক্কার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তিনি আরবী ভাষা জানিতেন না। যখন সুপ্রসিদ্ধ বোগ্দাদ নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই সময়ে শিষ্যেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে মহর্ষির কথোপকথন সাধারণের বোধগম্য করাইবার জন্য জনৈক অনুবাদকের আবশ্যক; নতুবা বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঋষিরাজ বোগ্দাদে উপনীত হইলে তপস্বিকুল-শিরোভূষণ মহাত্মা জুনেদ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণার্থ আপন শিষ্যগণকে প্রেরণ করেন, আবু হেফ্‌স্‌ তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি জুনেদের আলয়ে পদার্পণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এরূপ সদালাপ করিতে লাগিলেন যে,

সকলে শুনিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাষার পারিপাট্যে ও শব্দবিন্যাসে অনেককেই পরাভব মানিতে হইল। বোগ্দাদের অনেক খ্যাতনামা লোক তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহারা "মহত্ত্ব কাহাকে বলে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আবু হেফ্‌স্ কহিলেন, "আপনাদের ভাষায় দক্ষতা আছে, অতএব অগ্রে আপনারা ইহার বর্ণনা করুন, পরে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।" তখন মহর্ষি জুনেদ বলিলেন,—"আমার তাহাই মহত্ত্ব বলিয়া অনুমিত হয়, যে অনন্য-দুষ্কর বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া নিজকৃত বলিয়া প্রচার না করে। আমি ইহা করিয়াছি, এরূপ বলা মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।" ইহা শুনিয়া আবু হেফ্‌স্ কহিলেন, "আপনার কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি বলি, সূক্ষ্মরূপে অপরের বিচার করিয়া দেওয়া, কিন্তু অপরের নিকট বিচার প্রত্যাশা না করা ইহাই মহত্ত্ব।" জুনেদ এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে ইহা পালন করিতে অনুরোধ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি জুনেদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আবু হেফ্‌স্ মক্কার পথে যাত্রা করত এক বিশাল প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থলে তিনি ষোল দিন পর্য্যন্ত জলাভাবে কষ্ট পাইয়াছিলেন। পরে একদা জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া "বিদ্যা ও

বিশ্বাসের মধ্যে প্রধান কি ?” এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় আবু তোরাব নখ্‌শবী আগমন করিলেন। তিনি আবু হেফ্‌স্‌কে কহিলেন "তুমি কি জন্য এস্থলে অপেক্ষা করিতেছ ?” আবু হেফ্‌স্‌ আপন বক্তব্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, “বিদ্যা ও বিশ্বাসের মধ্যে যদি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমি জলপান করিব, অন্যথা করিব না ; যথেচ্ছা প্রস্থান করিব।” নখ্‌শবী এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “বুঝিলাম, তুমি এক জন খ্যাতনামা পুরুষ হইবে, তোমার সুনির্ম্মল যশে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইবে।” পরে তাপসপ্রবর মক্কায় উপস্থিত হইয়া এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি দরিদ্র লোক অভাবের নির্ম্মম নিষ্পেষণে অতীব কষ্টে কালযাপন করিতেছে।” তখন তাঁহার হস্তে একটী কপর্দ্দকও ছিল না, কিন্তু তাহাদিগকে কিছু দান করিতে বাসনা হওয়ায় তাঁহার অন্তরে এমন এক ভাবের উদ্রেক হইল যে, তৎপ্রভাবে তিনি একখানি প্রস্তর তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “তোমার সম্মানের অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি এক্ষণে আমাকে কিছু দান না কর, তবে এই প্রস্তরাঘাতে তোমার মস্‌জিদের যাবতীয় আলোকাধার চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিব।” ইহাই বলিয়া যথাবিধি সম্মান সংরক্ষণের সহিত পবিত্র কা'বার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন। সেই সময়ে জনৈক লোক অলক্ষ্যে উপনীত হইয়া তাঁহার হস্তে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া প্রদান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। তখন তিনি সেই দৈবলব্ধ অর্থ মহানন্দে দরিদ্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। অনন্তর যথাকালে হজ্‌-ক্রিয়া সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এক সময়ে আবু হেফ্‌স্‌ মহাত্মা শিব্‌লীর গৃহে চারি মাস অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিব্‌লী তাঁহার সেবা করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই; প্রতিদিন উপাদেয় পান-ভোজনে পরমাদরে অতিথি-সংকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত করা সত্ত্বেও তিনি বিদায় গ্রহণকালে ধীরভাবে কহিলেন, "শিব্‌লী! যদি কখন নেশাপুরে গমন কর, তবে পৌরুষ কাহাকে বলে ও অতিথি-সেবা কিরূপে করিতে হয়, তোমাকে দেখাইয়া দিব।" শিব্‌লী লজ্জাবনত-বদনে কহিলেন,— "তবে বুঝি আমার কোন ত্রুটি হইয়াছে?" আবু হেফ্‌স্‌ কহিলেন,—"ত্রুটি নহে, অতিথি-সংকারে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করায় পুরুষত্ব হয় না। অতিথির সেবা এরূপে করা উচিত যে, যেন তাহাতে মন সঙ্কুচিত না হয়, বরং তাহার প্রস্থানে সঙ্কোচ বা ক্লেশ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু যদি তাহাতে কষ্ট স্বীকার করা হয়, তবে তোমার অতিথির আগমনে অসন্তোষ ও প্রস্থানে মঙ্গল বোধ

হইবেই হইবে। অতিথি-সেবায় যে এরূপ করে, তাহার পৌরুষ কোথায়?” ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পরে একদা শিব্‌লী নেশাপুরে আবু হেফ্‌সের ভবনে উপনীত হইলেন। সেই দিন তথায় আরও চল্লিশ জন অতিথির সমাগম হয়। আবু হেফ্‌স্‌ তদ্দর্শনে অতীব প্রফুল্ল হইয়া একচল্লিশটী প্রদীপ জ্বালিয়া চতুর্দ্দিক্‌ আলোকমালায় আলোকিত করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া শিব্‌লী বলিলেন,—“আপনি না বলিয়াছিলেন, অতিথি আসিলে কষ্ট স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে?” মহর্ষি কহিলেন, “আমি কি কষ্ট করিলাম?” শিব্‌লী বলিলেন, “কষ্ট স্বীকার করিয়া একচল্লিশটী প্রদীপ জ্বালার প্রয়োজন কি? একটী জ্বালিলেই তো যথেষ্ট হইত।” তিনি বলিলেন, “তবে তুমি নিবাইয়া দাও।” তদনুসারে শিব্‌লী প্রদীপের উপর ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে একটী মাত্র প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল; সহস্র যত্নেও অপর চল্লিশটী নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইলেন না; তৎসমুদয় সমভাবে আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তখন শিব্‌লী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “এ কি অপরূপ ঘটনা! আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” আবু হেফ্‌স্‌ কহিলেন, “চল্লিশ জন অতিথি পরম পিতার প্রেরিত; আমি তাঁহাদের

প্রত্যেকের জন্য পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রফুল্ল-চিত্তে এক একটী দীপ জ্বালিয়াছি এবং তোমার কারণেও একটী জ্বালা হইয়াছে। সেই একটী প্রদীপ তুমি নির্ব্বাণ করিতে পারিয়াছ: কিন্তু অপরগুলি নিবাইতে পরাভব মানিলে! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, ইহাকে ক্লেশ স্বীকার করা বলা যাইতে পারে না; বরং ইহা বিশ্বনিয়ন্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

মহর্ষি আবু হেফ্‌সের তপস্বী-জীবনের ক্রিয়া-কলাপের অলৌকিকত্বের ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার কঠোর অধ্যবসায়, প্রভূত ত্যাগ-স্বীকার ও অদ্ভুত আত্মসংযমের বিষয় শ্রবণ করিলে হৃদয় অপরূপ বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হয়। তাঁহার উক্তিসমূহ ধর্ম্মজ্ঞান লাভের ভাণ্ডার স্বরূপ। তিনি জন-সাধারণের এমনি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন যে, [illegible] পরবর্ত্তী সময়ে জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন [illegible] পরে আবু হেফ্‌সের পদতলের দিকে তদীয় মস্তক স্থাপন করিয়া কবর দিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয় পাঠক, এতদপেক্ষা ধার্ম্মিকতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আর কি হইতে পারে!

সমাপ্ত

কবিবর মোজাম্মেল হক্ প্রণীত গ্রন্থাবলী--

হজরত মোহাম্মদ—হজরতের পবিত্র চরিতামৃত সুমধুর কবিতায় গ্রথিত। পঞ্চম সংস্করণ, দেড় টাকা। **ভারতবর্ষ** বলেন,—"মহাপুরুষের জীবন যেমন পবিত্র, জীবনী-লেখকও তেমনি পবিত্রভাবে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।" **প্রবাসী** বলেন,—"পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" **মানসী ও মর্ম্মবাণী**—বলেন,—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।" **হিতবাদী** বলেন,—"লেখক সুকবি, বর্ণনায় তাহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকখানিতে সর্ব্বত্র লেখকের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।"

মহর্ষি মনসুর—'আনাল হক্' বা 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাণীর প্রচারক মহাতাপস মনসুরের জীবন-কাহিনী। নবম সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **প্রবাসী** বলেন,—"এই চরিত-কথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।"

ফেরদৌসী-চরিত—প্রাচ্যরাজ্যের 'হোমার' মহাকবি ফেরদৌসী তুসীর জীবন-বৃত্তান্ত। একাদশ সংস্করণ; মূল্য এক টাকা। **প্রবাসী** বলেন,—"ভাষা ও রচনা-প্রণালী উত্তম। যাঁহারা এই জীবন-চরিত পড়িবেন, তাঁহাদের এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য **'শাহ্‌নামা'** পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা 'শাহ্‌নামা' পড়িবেন, তাঁহারা অবশ্য 'শাহ্‌নামা'র কবির কাহিনী পড়িবেন।"

শাহ্‌নামা—বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য পারস্য 'শাহ্‌নামা'র [illegible] গদ্যানুবাদ। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য আড়াই টাকা। **প্রবাসী** বলেন,—"এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎ-বিখ্যাত কাব্যের পরিচয় লাভ করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে, এজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিরাট্ কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।" **বঙ্গবাসী** বলেন,—"শাহ্‌নামা পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠের সুখ অনুভূত হয়।"

টীপু স্থলতান—মহীশূর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি মহাবীর টীপু স্থলতানের সচিত্র জীবন-কাহিনী। মূল্য এক টাকা। **আনন্দ বাজার পত্রিকা** বলেন,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে স্বাধীনতার এক জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টীপু স্থলতান। ভারতের ইতিহাসে এই সাহসী বীরের আত্মোৎসর্গ অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জীবন-চরিত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার সযত্নে ঐতিহাসিক প্রমাণসহ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইতিহাস ও জীবন-চরিত দুই দিক দিয়াই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।"

জাতীয় ফোয়ারা—প্রাণোন্মাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী সামাজিক কাব্য। নিদ্রিত সমাজের কর্ণে প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন-সঙ্গীত। **প্রবাসী** বলেন,—"মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া চিক্-চিক্ করিয়া উঠিয়াছে।" তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

হাতেম তাই—বালক-বালিকাদের চিত্তহারী শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ উপহার দিবার অতি উপাদেয় পুস্তক। সেই অতীত যুগের অমর কাহিনী—সেই বিশ্ববিখ্যাত দানবীর পরোপকারী হাতেমের অদ্ভুত কাহিনীপূর্ণ জীবন-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

হিমালয়-অভিযান—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রঙ্গীন [illegible] এবং বহু চিত্র-পরিশোভিত। সুন্দর বাঁধা; মূল্য বারো আনা। **আনন্দ বাজার পত্রিকা** বলেন,—"হিমগিরির অভ্রভেদী [illegible] মানুষের চিরন্তন বিস্ময়। আজ মানুষের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা [illegible] জয় করিবার অভিযানে বাহির হইয়াছে। হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গে আরোহণের বহু চেষ্টা হইয়াছে। তাহারই কৌতূহলপ্রদ ভয়াবহ বিবরণ অতি সুন্দর ভাষায় লেখা। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের সম্পদ।"